গ্র হা ন্ত রে র সু খ

কা জী জ হি রু ল ই স লা ম

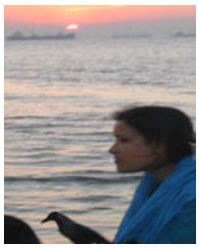

গলির মাথায় যে কদম গাছটা, যার নিচে কয়েকটি উলঙ্গ শিশু এ ওর গায়ে কদম ফুল ছুঁড়ে হাতের নিশানা পরখ করছে, ওটা পেরিয়ে বড়জোর দশ পা ডানে এগুলেই রাস্তার বাঁ দিকে একটা এদো ডোবা; অর্ধেকটা রাস্তা যেখানে মনের খেয়ালে নেমে গেছে, বাকীটাও যাই যাই করছে । কদিন আগেও ডোবাটা পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত মানুষের মতো রুগ্ন কচুরিপানায় ঠাসা ছিলো। গত তিনদিনের অবিরাম বর্ষণে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠাতে কচুরিপানাগুলো যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। ওদের মধ্যে এখন আর জড়াজড়ি ভাবটা নেই। যেন প্রতিটি পানাই ওর নিজস্ব একটা স্পেস খুঁজে পেয়েছে।

শব্দটা ওখান থেকেই আসছে। একদল সোনাব্যঙ বর্ষার নতুন পানিতে উৎসব আনন্দে মেতে উঠেছে। এখনো টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির জল গায়ে পড়াতে ওরা মনের আনন্দে মকপেত মকপেত শব্দে কোরাস গাইছে। প্রতি বর্ষায় আষাঢ়ে ব্যঙের এই দলীয় সঙ্গীত শুনে বেড়ে উঠলেও আজকের সকালটি ওর কাছে অন্যরকম লাগে। শব্দের উৎস খুঁজতে ইচ্ছে করে। লোহার বড় গেইটের ডানদিকে মানুষ আসা-যাওয়ার জন্য যে ছোট একটি গেইট রয়েছে ওটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসে অপু। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে এখনো। ছাতা নেয়নি ও। গালে, কপালে বৃষ্টির ছোট ছোট ফোটার স্পর্শ খারাপ লাগছে না। গলির ওপর উঠে আসতেই এক পশলা ঠান্ডা বাতাশের সাথে কদম ফুলের ভেজা ঘ্রাণ এসে নাকে লাগে। মনটা কেমন চনমনিয়ে ওঠে। আজকের সকালটি সত্যিই আলাদা।

কদমগাছের নিচের উলঙ্গ পথশিশুগুলি, যাদের একজন প্রতিপক্ষের ভয়ে দৌড়াতে গিয়ে এইমাত্র পা পিছলে কাদায় পড়ে গেলো, অপু তাকিয়ে আছে ওর পরাজিত এবং কাদো কাদো মলিন মুখটার দিকে। ঠিক তখনি হঠাৎ ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে ও।

‘এই শোন’

অস্বাভিক, অথচ কেন যেন মনে হচ্ছে খুবই প্রত্যাশিত, ঘটনাটি ওকে চমকালো ঠিকই কিন্তু ওর ভেতরে কোথায় যেন একটা নাড়া পড়লো। রোজই এ পথ মাড়িয়ে, ঠিক এ সময়টাতেই, একটা চামড়ার ব্যাগ নিয়ে মানুষটি হাঁটতে হাঁটতে গলিটা পেরিয়ে প্রগতি সরণীতে উঠে যায়। তাহলে কি ব্যঙের ডাক শুনতে কিংবা বৃষ্টিতে ভিজতে না, ওর অবচেতন ওকে এ সময়ে রাস্তায় নামিয়েছে এই মানুষটির সাথে দেখা হওয়ার জন্য? আর এজন্যই কি আজকের সকালটি ওর কাছে অন্যরকম, আলাদা মনে হচ্ছে? মানুষের মন বড়ই রহস্যময় আর জটিল, সবসময় হিসেব মেলানো যায় না। অপুর প্রায়ই ইচ্ছে হয় মানুষটিকে ডেকে অন্তত নামটা জিজ্ঞেস করে, কিন্তু হয়ে ওঠে না। সাহস হয় না, যা ওর চরিত্রের সঙ্গে একেবারেই বেমানান। কেমন যেন একটা ভয়ের বেড়াল ওর বুকের মধ্যে সেধিয়ে যায়, হাত-পা গুটিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ভয়টাকে ও কিছুতেই তাড়াতে পারে না। অথচ এ পাড়ার কে না জানে অপুর দস্যিপনার কথা। সব সাহসের প্রকৃতি বুঝি একরকম হয় না। মানুষটিকে দেখলেই ভয়ের আঁড়াল থেকে একটা অন্যরকম শিহরণ জেগে ওঠে, ও কেঁপে কেঁপে ওঠে। কিসের ভয়, আর কেনইবা লোকটির সাথে কথা বলতে এতো ইচ্ছে হয়? বুঝতে পারে না অপু। এর নিশ্চয়ই শুধু মনস্তাত্বিক না, বায়োলজিক্যাল কোন কারণও রয়েছে। মিলির কথা ভাবে অপু। মিলি ওর বড় বোন। তের বছরের বড়। মিলি একবার বলেছিলো, যৌবন মানুষকে এলোমেলো করে দেয়। মনিরের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার অনেক বছর পর মিলি একদিন অপুকে একথা বলেছিলো। যৌবন আসলে কি, অপু এখনো এর স্বরূপ আবিস্কার করতে পারেনি। তাহলে কি

এরই নাম যৌবন, কোন সুদর্শন যুবকের সাথে কথা বলতে ইচ্ছে হওয়া। মিলি আরো বলেছিলো, যৌবন এসে ভর করলে নাকি সব পুরুষকেই সুন্দর লাগে। আজকাল ও লক্ষ্য করেছে, চ্যাপ্টা নাকঅলা জাপানি সাইজের দুলাভাইটাকেও ওর খারাপ লাগে না। অথচ আপুর বিয়ের পর দুলাভাইয়ের নাসিকা নিয়ে কতো রসিকতা করেছে অপু।

খরগোশ শ্বাবকের মতো চঞ্চল পা দুটো হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। ঘুরে দাঁড়ায় অপু। ঘুরেই স্ট্রেইট তাকালো যুবকের চোখের দিকে। তাকিয়েই গন্তব্যহীনতায় ভোগে অপু। কালো সানগ্লাসের আঁড়ালে স্থির দুটি চোখ অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা আততায়ীর মতো আরো বেশী অপ্রস্তুত করে তোলে ওকে।

কেমন যেন একটা শরীর অবশ করা ভয় ওর হৃদপিন্ডে হাতুড়ি পেটাচ্ছে। একচুলও নড়তে পারছে না ও। ইচ্ছে হচ্ছে এক্ষুণি ছুটে পালাতে। একদৌড়ে গেটের ভেতরে ঢুকে সোজা দোতলায় উঠে নিজের ঘরে ঢুকে দরোজা বন্ধ করে দিতে। অথচ ওর পাদুটো ভীষণ ভারী হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে ওকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে, ওর দুপা যীশুর মতো পেরেক মেরে কেউ মাটির সঙ্গে গেথে দিয়েছে। এরপর একটা অজানা, অচেনা শিহরণ ধীরে ধীরে ওর পা থেকে শিরদাঁড়া বেয়ে মাথায় উঠে এলো । অপু বুঝতে পারে না ওর ভালো লাগছে না খারাপ লাগছে।

লোকটি এবার ওর দিকে এগিয়ে আসে। খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। কালো সানগ্লাসের হাত থেকে মুক্তি পায় ওর দৃষ্টি; স্থির, গভীর দুটি চোখ।

কি নাম তোমার?

খুব ছোট্ট করে ওকে প্রশ্ন করে পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চির ছিপছিপে যুবক। এতো দ্রুত প্রশ্নটা করে যে পুরো দশ সেকেন্ড ভেবে এর মর্মোদ্ধার করতে হয় অপুকে। অথবা এ-ও হতে পারে, অপু এখন আর এই মাটির পৃথিবীতে নেই, হয়ত অন্য কোন গ্রহে খুঁজছে নতুন নিবাস।

অপু।

একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়েই কণ্ঠ কেঁপে ওঠে, গলায় কথা জড়িয়ে যায়।

আমি অমিত। এ পাড়াতেই থাকি।

অমিতের কথাগুলো আর শোনে নি অপু। পায়ের পেরেক আলগা হতেই একছুটে নিজের ঘরে পৌছে যায়। ও-কি এখন সিনেমার নায়িকাদের মতো লজ্জা ঢাকতে বালিশে মুখ লুকিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়েছে, নিশ্চয়ই না। অপু অন্যরকম মেয়ে।

সেই অন্যরকম মেয়েটিই এই মুহূর্তে অমিতের সমস্ত চিন্তজগৎ দখল করে আছে। মেয়েতো দূরের কথা, আজ অব্দি কোন অচেনা ছেলের সাথেও যেচে কথা বলে নি ও। আজ ওর কি হলো। মেয়েদের প্রতি ওর আজন্ম ঘৃণা কোথায় পালালো। এই ঘৃণার জন্ম হয়েছিলো একটা ভয় থেকে। শৈশবের সেই দুষ্ট ভয়টি আজো মাঝে-মধ্যে ওর সমস্ত শরীরকে সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরে, তারপর সুযোগ বুঝে ছোবল মারে ঠিক ওর দুই ভ্রূর মাঝখানে। এতে ওর মৃত্যু হয়না ঠিকই কিন্তু মৃত্যু যন্ত্রণা হয়। সেই যন্ত্রণায় ও ছটফট করতে থাকে। ছটফটানির নীল ডানায় ভর দিয়ে বাইশ বছর আগের সেই দিনটিতে আজ আবার একবার ফিরে যায় অমিত।

মুনা আন্টির কথা যতোবারই মনে হয়েছে ততোবারই ওর চোখের সামনে বড় বড় দাঁতের এক ডাইনির ছবিই ভেসে উঠেছে, এক দয়ামায়াহীন নির্মম ড্রাকুলা। অথচ এই মুনা আন্টিই ছিলো ওর শৈশবের প্রথম বন্ধু, সার্বক্ষণিক খেলার সাথী। দিনের বেশীরভাগ সময়ই কাটতো মুনা আর ওর ছোট ভাই রুবেলের সাথে খেলা করে। মুনা অমিতের চেয়ে বছর পাচেকের বড়। অমিত তখন খুব ছোট, ছ বছরের শিশু। ওর দুচোখে রাজ্যের বিস্ময়। যা দেখে তাতেই বিস্মিত হয়। বিস্মিত হবার আশ্চর্য এক ক্ষমতা থাকে শিশুদের। ও তখন মাত্র স্কুলে ভর্তি হয়েছে। শাদা শার্ট আর নেভি ব্লু হাফ প্যান্ট পরে ও আর রুবেল হাত ধরাধরি করে স্কুলে যায়। হঠাৎ ওর খুব শখ হলো লুঙ্গি পরার। কেন যেন মনে হলো, লুঙ্গি না পরতে পারলে জীবনটাই বৃথা। অনেক কান্নাকাটির পর বাবা-মায়ের অমতে দাদু ওকে একটি লাল রঙের চেক লুঙ্গি কিনে দেয়। লুঙ্গিটা দেখতে ছিলো অনেকটা ওদের দুধঅলার কোমরে বাঁধা লাল গামছাটার মতো। কি জানি, এ-ও হতে পারে দাদু একটা বড়সড় গামছাই সেলাই করে এনে ওর হাতে দিয়ে বলেছিলেন---এই নাও তোমার লুঙ্গি। শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারের সব বাচ্চা ছেলেদেরই লুঙ্গি পরার একটা আগ্রহ থাকে, বাচ্চা মেয়েগুলো যেমন লুকিয়ে মায়েদের শাড়ি কিংবা ওড়না সারা গায়ে পেঁচিয়ে শাড়ি পরতে চায়। আসলে শিশুরা নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ভবিষ্যত পিতা-

মাতাকেই খুঁজে পেতে চায়। পোশাক বদল করে সাজতে চায় বাবা কিংবা মা। দাদুর কিনে দেওয়া লাল লুঙ্গিটা পেয়েতো মহাখুশি অমিত।

সেদিন ছিলো রুবেলের জন্মদিন। জেদ ধরলো অমিত, লুঙ্গি পরেই জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যাবে। কিছুতেই ওকে ফরমাল ড্রেস পরতে রাজী করানো গেল না। শিশু অধিকার সংরক্ষণের জন্য তখন এতো এনজিও ছিল না। মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে তেমন কোন সচেতনতাও ছিল না। স্কুলে শিশুদেরকে পেটানোতো ছিল এক মহৎ কর্ম। পিতা-মাতাগণ ছেলে-মেয়েকে স্কুলে দিয়ে শিক্ষককে বলতেন, হাঁড়গুলো আমার আর মাংসগুলো আপনার। কি নির্মম। কিন্তু অমিতের বাবা মা ছেলের লুঙ্গি পরার অধিকারের প্রতি শেষ পর্যন্ত সম্মান দেখালেন। লুঙ্গি পরেই অমিত ও বাড়িতে গেল। কেক কাটতে এখনো অনেক সময় বাকী আছে, স্কুল থেকে ওর অনেক বন্ধু এসেছে, খুব মজা হবে আজ। অমিতকে লুঙ্গি পরা অবস্থায় দেখে মুনা দৌড়ে এসে ওকে হাত ধরে টানতে টানতে নিজের ঘরে নিয়ে গেলো। কিশোরী মুনার তখন অনেক বান্ধবী। মুনার ঘরে ঢুকে অমিত দেখে ও-ঘরে সাত-আটজন মেয়ে, একটিও ছেলে নেই। ও বেরিয়ে আসতে চাইলে মুনা ওকে লোভ দেখায়। আজ আমরা একটি মজার খেলা খেলবো। অমিত তখনো জানে না সেই মজার খেলার খেলনা হতে যাচ্ছে ও নিজেই। মুনার নির্দেশে সবগুলো মেয়ে হাত ধরাধরি করে ঘরের মধ্যে একটি বৃত্ত রচনা করলো। বৃত্তের ভেতরে ওরা দুজন, মুনা আর অমিত। মুনা এবার ওকে বললো, অমিত তুই চোখ বন্ধ কর। চোখ বন্ধ করে অমিত। এবার বানান কর, ফোরটি নাইন, দেখবি একটা দারুণ মজার খেলা হবে। অমিত বানান করে 'এফ ও আর টি ওয়াই.....' আর তখনি মুনা একটানে ওর লুঙ্গিটা খুলে ফেলে। লজ্জায়, অপমানে, কাঁদতে কাঁদতে অমিত ছুটে বাড়ি চলে যায়। ওর আর বন্ধুদের সাথে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আনন্দ করা হলো না। বাড়ি ফিরে কষ্টে, আপমানে ওর বুক ফেটে যাচ্ছিলো। কেন বাবা-মায়ের কথা শুনলাম না, এই অনুশোচনায় ওর আরো বেশী করে কান্না পাচ্ছিলো। বিস্মিত হবার ক্ষমতার মতো শিশুদের বুঝি অপমানিত হবার ক্ষমতাও তীব্র।

সেদিনের সেই দৃশাটি মনে হলে আজও মুনার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু কোথায় পাবে ওকে। ও-তো এখন স্বামীর সাথে জার্মানীতে বসে দিব্যি মউজ করছে, হয়ত সেই মজার খেলা আজো খেলছে।

সেই থেকে মেয়েদের প্রতি ওর আজন্ম ঘৃণা জন্মায়। আসলে প্রকৃতপক্ষে ও মেয়েদেরকে ভয়ই পায়। পারতপক্ষে মেয়েদের ধারে-কাছে ঘেষতে চায় না। এমন কি ও লক্ষ্য করেছে নিজের অজান্তেই ভাবীকেও মাঝে-মধ্যে এড়িয়ে চলে। কিন্তু কই, অপুকেতো ওর একটুও ভয় করে নি। কোত্থেকে এলো এতো সাহস। এ সাহসের উৎস কোথায়? তবে কি এরই নাম ভালোবাসা, প্রেম? আমি কি অপুকে ভালোবাসি? ভালোবাসা না-কি মানুষকে সাহসী করে তোলে। মনটা কেমন ফুরফুরে লাগছে। ভয়, ঘৃণা এই জিনিসগুলো কেমন যেনো ওর মাথা থেকে ক্রমশ মুছে গিয়ে মাথাটা হালকা হয়ে উঠছে।

অপুর অপূর্ব মুখের আদলটা, যা টি-শার্ট এবং জিনসে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, মস্তিস্কের রেড চেম্বার থেকে ইয়েলো চেম্বারে ঢোকাতে ঢোকাতে অফিসে ঢোকে অমিত। একবার বাঁ হাতটা বুকের কাছে তুলে ক্যাসিও ইলেক্ট্রনিক ঘড়িটাতে চোখ বুলায় ও। দশটা পনের। দ্যাট মিনস, ফিফটিন মিনিটস লেইট। বুড়ো আজ নেবে একচোট। ব্যাখ্যাতীত চরিত্রের অধিকারী এই বুড়ো। দীর্ঘ শাদা চুলগুলো সুস্পস্ট একটি সরলরেখার মতো সিথির দুপাশ থেকে কাধ অব্দি নেমে এসে ওর মুখটাতে একটি মেয়েলি কোমলতা তৈরী করেছে। সারাক্ষণ কেবল চেচামিচি, হৈ চৈ করে পুরো অফিস মাতিয়ে রাখেন কেমিস্ট্রির এই প্রবীন অধ্যাপক ড. ইশতিয়াক অহমেদ। অফিসের সবাই যার নাম দিয়েছে পাগল বিজ্ঞানী।

বাইরে যতোই হৈ চৈ চেচামেচি করুন না কেনো, পাগল বিজ্ঞানীর ভেতরটা কিন্তু ওর চুলগুলোর মতোই শাদা।

এই যে অমিত, তুমি এসেছো। চলো, ল্যাব-এ চলো। একটা দারুণ কাজ করেছি, তোমাকে না দেখালে শান্তি পচ্ছি না।

দারুণ জিনিসই বটে। গত এক সপ্তাহ আগে একটি সফল ল্যাব টেস্ট করেছেন বুড়ো। আমাদের দেশের প্রাকৃতিক বাঁশকে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট-এর মাধ্যমে স্বাভাবিকের চেয়ে দশগুন বেশী টেকসই করা যায়। ভাবা যায় একটি বাঁশের খুঁটি এখন থেকে টেকসই হবে প্রায় ত্রিশ/চল্লিশ বছর। গ্রামের দরিদ্র মানুষদের এখন থেকে আর তিন/চার বছর পরপর ঘরের খুঁটি বদলানোর মতো একটি ব্যায়সাপেক্ষ কাজ করতে হবে না। এ যে কতো বড় কল্যাণকর আবিস্কার তা কেবল ওরাই বুঝবে যারা এর বেনেফিশিয়ারি, আটষট্টি হাজার গ্রামের দরিদ্র মানুষ। মনে মনে ভাবছে অমিত ল্যাব-এ ধরে নিয়ে গিয়ে বুড়ো সেই ফর্মূলাটাই আবার দেখাবে, যা তিনি গত এক সপ্তাহে অফিসের সবাইকে কম করে হলেও দশবার করে দেখিয়েছেন। যে কোন আবিস্কারেরই একটা উচ্ছাস থাকে, কিন্তু এই ড. পাগলের উচ্ছাসটা যেন একটু

বেশীই। উচ্ছাসের দাপটেই বোধ হয় দৈনন্দিন বিষয়গুলো একেবারেই মনে রাখতে পারেন না। বিলম্বে অফিসে আসার জন্য এখন অমিতকে একটা ধমক দেবার কথা ছিলো। তিনি তা দেন নি। ধমকটা যাতে পরেও খেতে না হয় সেজন্য অমিত ভাবছে, ওর কথামতো ল্যাব থেকে ঘুরে আসাই ভালো। যদিও এতে অন্তত একটা ঘন্টা যাবে। আর এছাড়া কিইবা করার আছে, এ অফিসের কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে ড. ইশতিয়াকের নির্দেশ অমান্য করে।

ল্যাব-এ ঢুকে ওর ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। সত্যি সত্যি একটা দারুণ কাজ করেছেন বুড়ো। অসাধারণ আবিস্কার। লোকটার সোশ্যাল কমিটমেন্ট আছে বলতে হবে। সত্যি ও আজ যা আবিস্কার করেছে যদি এর সঠিক এবং ব্যাপক ব্যাবহার শুরু করা যায় তাহলে দেশ অনেকদূর এগিয়ে যাবে। ক্যামিকেল রি-অ্যাকশনের মাধ্যমে মাছের কাঁটা থেকে তৈরী করা যায় জীবন রক্ষাকারী কিছু দামী মেডিসিন, শুধু তা-ই না, পচা আবর্জনা, পশুর হাঁড়, তরিতরকারীর ফেলনা অংশ এসব থেকেও তৈরী করা যায় সার, পোল্ট্রি এন্ড ডেইরি ফিড। এরপর পাগল বিজ্ঞানী যে কথাটা বললেন সেটা শোনার জন্য অমিত তৈরী ছিলো না মোটেও। হিউম্যান বর্জ্য (মানুষের গু) থেকেও নাকি সুস্বাদু খাবার বানানো সম্ভব। পৃথিবীর কোনো কোনো দেশ না-কি ইতোমধ্যেই নর্দমার পানি (মুতের পানি) পিউরিফাই করে খাবার পানিতে রূপান্তরিত করছে। অমিত জানে এরপর বুড়ো শুরু করবে তার সবচেয়ে প্রিয় বিষর সোলার এনার্জির ওপর বক্তৃতা। সত্যিই দেশ ও মানুষের জন্য বুড়োটা বেশ ভাবেন। কিন্তু ওর ভাবনা কি কখনো বাস্তবায়িত হবে? এমন কত আবিস্কারের কথাইতো মাঝে মাঝে খবরের কাগজে বের হয়। কই, একটারওতো কোনো বাস্তবায়ন দেখা যায় না। এদেশের প্রতিভাবান মানুষেরা এভাবেই নিরুৎসাহিত হতে হতে একদিন তেলহীন প্রদীপের মতো ফুরিয়ে যায়, আর নয়তো সুযোগের সন্ধানে পাড়ি জমায় বিদেশে। দেশ ক্রমশই এভাবে মেধাশূন্য হয়ে পড়ছে। আমাদের রাজনীতি কিংবা বিচক্ষণ সরকারগুলো কি এসব নিয়ে ভাবেন, এতো সময় কই ওদের।

পৃষ্ঠা উল্টাতে চায় অমিত। পাগল বিজ্ঞানী আর অসহায় ক্ষুধার্ত, দরিদ্র মানুষের ভূখা-নাঙ্গা ছবি দিয়ে সাজানো এই কুৎসিত সমাজচিত্রটাকে চোখের সামনে ঝুলিয়ে রেখে আজকের এই বিশেষ এবং চমৎকার সলাকটাকে ম্লান করে দিতে চায় না। এই কঠিন বাস্তবতাকে এড়ানোর কোনো উপায় নাই জেনেও, অন্তত কিছুটা সময়ের জন্য ছুটি নিতে চায় অমিত। আজ শুধু একজনকে নিয়েই ভাবতে চায়। এই অনন্ত সুন্দর পৃথিবীতে, এক অনিন্দ্য সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে ও আজ, এর পাশে পভার্টির মতো বিশ্রী শব্দটাকে কিছুতেই দাঁড় করাতে চায় না।

নিজের রুমে ঢুকে দ্বিতীয় দফায় মেজাজটা বিগড়ে গেলো ওর। টেবিলের ওপর ছোটখাটো একটা ফাইলের পাহাড়। ফাইলগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখে অমিত। হ্যাঁ, খুব মন দিয়ে কাজ করলেও আট ঘন্টায় শেষ করা যাবে না। শালার বুড়ো পুরো বারোটা প্রজেক্টই আমার কাঁধে তুলে দিয়েছে, কলুর বলদ পেয়েছে। কষে একটা গাল দেয় ও বসকে। এটা একটা প্রফেশনাল সমস্যা। কেউ একটু দক্ষতার সাথে কাজ করলেও বিপদ আবার না করলেও বিপদ। কেউ ভালো কাজ করেছে কি আমনি তার ঘাড়ে আরো চাপাও। এদিকে যে চার/পাঁচজন দিব্যি গোঁফে তেল দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা কেউ দেখছে না। মুখ ফুটে একথা বলবারও কোন জো নেই। বসদের একটাই কথা, সব কাজ সবাইকে দিয়ে হয় না। হয় না তো ওই লোকগুলোকে পুষছেন কেনো? এ নিয়ে নিশ্চয়ই ম্যানেজমেন্টের ভাবা উচিত। এখন থেকে ভুল-ভাল কাজ করে রাখবো। মনে মনে একথা বললেও অমিত তা করে না, করতে পারে না। এটা একটা ইগোর ব্যাপার। কাজ ও মন দিয়েই করে। এবং আর সকলের চেয়ে ভালোই করে। যদিও জানে এর পুরস্কার একটাই, আরো কিছু বাড়তি কাজ।

মনে মনে গজরাতে গজরাতে রিসিভার কানে তোলে অমিত। জিরো ওয়ান, বাটন দুটো পুশ করতেই ওপাশ থেকে ড. ইশতিয়াকের ফ্যাসফ্যাসে গলা ভেসে এলো,

হ্যালো।

স্যার, বারোটা প্রজেক্টের ফাইলই আমার কাছে এসে গেছে।

ডোন্ট বি নার্ভাস মাই বয়। নো ওয়ান এলস ক্যান ডু দ্যাট ডিফিক্যাল্ট টাস্ক লাইক
বাজেট স্প্রেড, এক্সেপ্ট ইউ। আমি জেনেশুনেই সবগুলো প্রজেক্টের ফাইল তোমার কাছে পাঠিয়েছি।

খুব ভালো করেছেন স্যার। নইলে আমার বারোটা বাজাবেন কি করে।

শেষের বাক্যটি আর ভাষা খুঁজে পায় না। অমিতের ভেতরেই ফাল্গুনি হাওয়ার মতো পাক খেতে খেতে মিলিয়ে যায়। ওপাশ থেকে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হতেই অমিত রিসিভার নামিয়ে রাখে। আর তখনি ফাইলপত্রের আঁড়াল থেকে একটি টিকটিকি টিকটিক শব্দে ডেকে ওঠে। অমিত চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে সিলিং ফ্যানের হাওয়াটা বাড়িয়ে দেয়। ওর মুখোমুখি সিটে বসা রফিক সাহেব তখন ওর দিকে তাকিয়ে একটি রহস্যময় হাসি হাসে। এতে ওর আরো মেজাজ

খারাপ হয়। ও জানে এই হাসিতে কোনো এপ্রিসিয়েশন বা সহানুভূতি নেই, আছে তামাশা দেখে মজা পাওয়া। একাউন্টস অফিসার রফিকউদ্দিন এবার নিজের সিট থেকে উঠে এসে অমিতের টেবিলের সামনে রাখা হাতলবিহীন কাঠের চেয়ারটাতে বসে। ওর বসার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তুলতুলে একটি সোফায় বসেছে, বসে খুব আরাম পাচ্ছে। মুখে কোনো কথা নেই রফিকউদ্দিনের, একটা মিচকে হাসি ওর ঠোঁটের কোনে ঝুলিয়ে রেখে তাকিয়ে আছে অমিতের দিকে।

কিছু বলবেন?

জ্বী না।

ও আচ্ছা।

লোকটা তবু বসে আছে, অথচ কিছু বলছে না। অমিতের কাছে মনে হয় ওর নাকের ওপর একটা মাছি বসে আছে। ও আবার জিজ্ঞেস করে।

কিছু বলবেন রফিক সাহেব?

জ্বী না।

একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আশা করি ঠিক ঠিক জবাব দেবেন। আপনার নাকের ওপর কখনো মাছি বসেছে?

রফিক কোন জবাব দেয় না। ভোতা মুখ করে বসে আছে। এটা ভোতা মুখ দেখার সময় না। অমিতের বিরক্তি এবার ছাদ ছোয়।

রফিক সাহেব আপনার কি মাথায় কোনো সমস্যা হয়েছে?

জ্বী না মাথা ঠিকই আছে। একাউন্টস মিলে গেছে।

তো এবার মিষ্টি খাওয়ান। অমন ভোতা মুখ করে বসে আছেন কেন?

মিষ্টিতো খাওয়াবেনতো আপনি জনাব।

আমি মিষ্টি খাওয়াবো? কেনো?

আশে-পাশে এতো কথা হচ্ছে আপনি কিছু শোনেন না?

কি কথা? গলাটা বাড়িয়ে রফিকের প্রায় কানের কাছে মুখ এনে বলে অমিত, কারো বিয়ে শাদী লাগলো না-কি?

লাগে নি, তবে লাগবে।

ঠিক আছে। সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে নিমন্ত্রণ করবেন, গিয়ে খেয়ে আসবো। এবার কি আপনি দয়া করে নিজের সীটে যাবেন, আমি একটু কাজে মন দিতে চাই।

হ্যা, তাই দিন। দুদিন পর যখন ইডি হচ্ছেন।

কথাটা বলেই চেয়ার থেকে উঠে যায় রফিকউদ্দিন। নিজের সীটে না গিয়ে সে সোজা রুম থেকে বেরিয়ে অফিসের বারান্দার দিকে হাঁটতে থাকে। রফিকের পেছন পেছন উঠে বারান্দায় যায় অমিত। রফিক একটা সিগারেট ধরিয়েছে, অমিতও একটা সিগারেট ধরায়। সিগারেটে টান দিয়ে বারান্দার গ্রিলের কাছে ঠোঁট নিয়ে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ধোয়া ছাড়ে ও। রফিককে দেখে মনে হচ্ছে ও অমিতের জন্য অপেক্ষা করছে এবং এক্সপেক্ট করছে অমিত ওকে কিছু জিজ্ঞেস করবে।

কি বললেন রফিক সাহেব? আমি কথাটার মানে ঠিকমতো বুঝলাম না।

গ্রিলের ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কথা বলে অমিত। ওখানে এখন ঘন মেঘ। তবে টিপটিপ বৃষ্টিটা আর পড়ছে না।

বুঝেছেন আপনি ঠিকই চৌধুরী সাহেব। ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন আর ভাব দেখাচ্ছেন কিছুই বুঝতে পারছেন না।

এরপর ওর উত্তেজিত হবার কথা। রফিককে একটা চড় মারতে না পারলেও ‘শুয়োরের বাচ্চা’ বলে গাল দেবার কথা। কিন্তু অমিত এসবের কিছুই করে না। বরং আগের চেয়ে আরো বেশী ঠান্ডা গলায় বলে,

আমি সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না। ইট মাস্ট বি অ্যা জোক। ইজ’ন্ট ইট?

অমিত ক্ষেপছে না দেখে রফিক বিরক্ত হয়। পরাজিত হওয়া চলবে না, এইরকম একটা প্রতিজ্ঞা ওর কণ্ঠে।

নট অ্যাট অল, আই মেন্ট ইট।

এবার অমিত কিছুটা ক্ষেপে যায়।

হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্যাট? আমি ইডি হচ্ছি এর মানে কি?

ইডি মানে বুঝলেন না। এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর। দি এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর অব সোশ্যাল এওয়ারনেস এন্ড রিসার্চ সেন্টার।

কি সব বাজে বকছেন। আমি কি ওই পাগলের ছেলে না জামাই যে আমাকে ইডি বানাবে? এ দেশে উত্তরাধিকার ছাড়া কিছু হয় না, একথা আমি যেমন জানি, আপনিও জানেন।

জানি বলেইতো বলছি।
আবারও হেয়ালী করছেন, কি জানেন বলেইতো বলছেন? কি জানেন, কি জানেন আপনি?
ওই যে বললেন, উত্তরাধিকার না হলে কিছু হয় না।
তো?
তো আর কি। ওই, উত্তরাধিকার....

অমিত এবার বিষয়টা আঁচ করতে পারে। স্যারের মেয়ে নায়লাকে নিয়ে কিছু একটা লিংক আপ করতে চাইছে রফিকউদ্দিন। এতো জঘন্য কেন হয় মানুষ? এদের হয়েছে 'নেই কাজ তো খই ভাজ' অবস্থা। সময় কাটাবার জন্য একটা রসঘন বিষয় দরকার। পরচর্চা অফিস-আদালতের একটি উত্তম বিনোদন। সিগারেটের বাটটাকে টোকা মেরে শূন্যে উড়িয়ে দিয়ে নিজের সীটে ফিরে আসে অমিত।

ফাইলগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে দুহাতে মাথাটাকে চেপে ধরে হাতের কনুই দুটি সমান্তরালভাবে টেবিলের ওপর রেখে ভাবনার সাগরে তলিয়ে যেতে চায় অমিত। আজ সারাদিন ও শুধু অপুকে নিয়েই ভাবতে চায়। সব কাজ ভেস্তে যাক আজ। ভালোবাসার কাছে আজ সবকিছুর পরাজয়।

আচ্ছা আমি কি অপুকে ভালোবাসি?
অবশ্যই। কনকর্ডের গতিতে শব্দটা ওর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।
কেমন ভালোবাসি?
ভীষণ।
ভীষণ কতটুকু?
পৃথিবীর কোন পরিমাপের যন্ত্র দিয়ে যা মাপা যায় না, ভালোবাসা পরিমাপের কোন একক নেই, ভালোবাসার কোন পরিমাপ হয় না।
অপু মেয়েটা দেখতে কেমন?
খুব সুন্দর। অপূর্ব। হোয়াইট টি শার্ট আর ব্লু জিনসে ওকে মনে হচ্ছিলো নীল সমুদ্রের একফালি ঢেউ। যাকে দেখলেই বুকের ভেতর ভালোবাসার বীজ অঙ্কুরিত হয়, বিকশিত হয়, ডালপালা মেলে দেয় শূন্যে, খোলা আকাশে।
অপু কি আমাকে ভালোবাসে?
মুখভর্তি বাতাশ নিয়ে গাল দুটো পটকা মাছের মতো ফোলায় অমিত। ঠোঁট দুটো উল্টে নিয়ে ডানহাতের মধ্যাঙ্গুল দিয়ে সেগুন কাঠের টেবিলের ওপর পরপর কয়েকটা টোকা দেয়। ওর ভেতরে বসে থাকা উত্তরদাতা কোন উত্তর দিতে পারছে না। কেটে যায় আরো খানিকটা সময়। হঠাৎ করে একটু অস্বাভাবিক শব্দ করেই বলে ওঠে ও, অবশ্যই। ঠিক পর মুহূর্তেই হাওয়া বেরিয়ে যাওয়া বেলুনের মতোই চিমসে যায়, কুঁকড়ে যায়। একটা হতাশা এসে ভর করে ওর মুখের মানচিত্রে, মানচিত্রটি ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে ওঠে।

সকালের ঘটনাটাকে রিওয়ান্ড করে আবার একটু দেখতে চায় ও।

অপুর নিস্পাপ, নিস্পলক, নিরহংকার, নির্নিমেষ নেত্রযুগল স্মৃতির উজ্জ্বল আরশীতে স্পষ্ট দেখতে পায় অমিত। দ্বিধাহীন তাকিয়ে আছে ওর চোখের দিকে। কতক্ষণ এভাবে তাকিয়েছিলো ওরা পরস্পরের নেত্রযুগলের প্রতি? পাঁচ, দশ, পনেরো মিনিট? নাকি আরো বেশী। পনের মিনিট। এক বিজ্ঞ অঙ্ক বিশারদের মতো ঝটপট জবাব দেয় ওর ভেতরের মানুষ। কারণ আজ অফিসে আসতে পনের মিনিট লেইট হয়েছে। অপু নিশ্চয়ই আমাকে ভালোবাসে। তা না হলে ওভাবে তাকিয়ে থাকবে কেন। ও যখন ছুটে পালালো, লোহার গেইট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলো, দৃষ্টির আঁড়াল হলো, তখন ওর পায়ে ছিলো লজ্জার জড়তা। ওতে অবজ্ঞা ছিলো না, প্রত্যাখ্যানের কোন আভাস ছিলো না। আত্মসন্তুষ্টি পেতে চায় অমিত। তাছাড়া অমন নিস্পলক তাকিয়ে থাকলো কেনো? ওর চোখেতো প্রিয়তম আত্মসমর্পনের একটি নির্লিপ্ত সুখের উঁকিই মাথা তুলছিলো। তা ছাড়া জিজ্ঞেস করতেই নাম বললো কেনো?

বা-রে, একজন ভদ্রলোক নাম জিজ্ঞেস করলে বলবে না?

নাহ। কোন কূল কিনারা খুঁজে পাচ্ছে না ও। আসলে প্রেম কি? ভালোবাসার সংজ্ঞা কি? এসবের ছাই মাথা ও কিছুই জানে না। নিজেকে কষে একটা গাল দিতে ইচ্ছে করে। তুমি একটা আস্ত আহাম্মক অমিত চৌধুরী। শুধু শুধু জীবনের এতোগুলো বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ি ভেঙেছো, এতোগুলো বসন্ত পার করেছো, পৃথিবীর আলো বাতাশে নিঃশ্বাস নিয়েছো।

কলাভবনের সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে যখন শেফুর সাথে ধাক্কা লেগেছিলো তখনি ওর জীবনে একটা কিছু ঘটে যেতে পারতো। কিন্তু তা ঘটেনি। ঘটেনি এজন্য যে ও মেয়েদের ঘৃণা করে এবং মেয়েদের কাছে ঘেঁষতে লজ্জা পায়। অমন লজ্জায় মরে যাবার মতো কি কিছু ঘটেছিলো? একটা ইডিয়েট। শেফুটা কতো ঘুরঘুর করলো। শেফুর ঘাড়ের ওপর ও কেবল মুনার মুখটাই দেখতে পেয়েছিলো, কালো নেকাবে ঢাকা। সেই নেকাবের আঁড়ালে লুকানো ভালোবাসার আলো ও কোনদিন খুঁজতে যায়নি। আজ মনে হচ্ছে প্রেম প্রেম একটা ভাবও যদি কারো সাথে হতো তাহলেও অন্তত প্রেমের সংজ্ঞাটা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে শেখা হতো। মুদ্রার নোংরা পিঠটাতে থু থু মেরেই প্রায় সারাটা জীবন পার করেছে। ঘৃণার উল্টো পিঠে যে নির্মল, পবিত্র প্রেম সোহাগী চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধ স্পর্শে হৃদয়-মনকে আলোকিত করে তা ওর কোনদিনই জানা হলো না। আজ জীবনের সাতাশটি বসন্তের ঝরাপাতা হঠাৎ দমকা বাতাশে উড়ে এসে ওর নিজের মুখেই ঝামটা দিচ্ছে। আর হৃদয়ের ওপর বিছিয়ে থাকা ঝরাপাতার স্তুপ সরে গিয়ে হঠাৎই যেন বেরিয়ে পড়েছে এক অমূল্য রত্ন। আজ এতো বছর পর এ কোন আলোর সন্ধান পেল ও? শত চেষ্টায়ও এ আলো ঢাকবার কোনো জো নেই। এই অলৌকিক আলোর স্পর্শে ওর মন থেকে কষ্ট, গ্লানি, ঘৃণার সমস্ত অশুভ অন্ধকার যেন এক ফুৎকারেই পালিয়ে বেঁচেছে। মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদের নামই বুঝি প্রেম। এর চেয়ে মূল্যবান, এর চেয়ে দামী আর কিছু নেই, কিছু হতে পারে না। কেবল প্রেম, কেবল ভালোবাসাই পারে একজন মানুষকে অন্ধকারের অতল গহ্বর থেকে আলোর পথে টেনে আনতে। প্রতিটি যুবক-যুবতীর প্রেম করা উচিত, প্রেমে পড়া উচিত। হৃদয়ের শুদ্ধতার জন্য, মনকে আলোকিত করার জন্য প্রতিটি মানুষের জীবনে প্রেম অপরিহার্য, প্রেম অনিবার্য। প্রেমের যাদুস্পর্শেই মানুষের হৃদয়ে মহত্ব, মহানুভবতার উন্মেষ ঘটে। মানুষের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা মানুষটি, মনুষত্বটি জেগে ওঠে। এতোদিন ওর মনে হতো প্রেম করা খুবই লজ্জার একটি বিষয়, খুবই গর্হিত গোপন একটি কাজ। সমাজ, সংসার জানতে পারলে কলঙ্ক হবে, লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। এ যে কতো বড় মূর্খতা আজ যেন এক মুহূর্তেই অমিত তা বুঝে ফেলেছে। ওর এখন ইচ্ছে করছে টিএসসিতে গিয়ে অনেক উঁচুতে একটা মাইক লাগিয়ে চিৎকার করে ঘোষণা করতে, হে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণী-তরুণ, যুবতী-যুবক, তোমরা সবাই প্রেম করো, মন-প্রাণ উজাড় করে তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসো। ভালোবাসার মঙ্গলময় আলোয় স্নাত হোক সকলের হৃদয়। মন থেকে বিতাড়িত হোক সকল অকল্যাণের অন্ধকার।

তাহলে কি এরই নাম প্রেম, ওর মধ্যে যে ওলট পালট শুরু হয়েছে? কেন যে মেয়েদের প্রতি ওর এতো ঘৃণা জন্মেছিলো। মুনাওতো সেদিন একটি শিশু বৈ আর কিছু ছিলো না। সেই এগারো বছরের দস্যি মেয়েটি কি অতোকিছু বুঝে ওকাজ করেছিলো? মজা করতে চেয়েছিলো, মজা পেতে চেয়েছিলো, বন্ধুদের মজা দিতে চেয়েছিলো। আজ এতোগুলো বছর পর টের পায় অমিত, মুনার প্রতি ওর আর কোনো ঘৃণা নেই, ক্ষোভ নেই। মুনার মুখ কল্পণা করে আজ আর ও কোনো ডাইনীর ছবি দেখতে পায় না। একটা ডানপিটে কিশোরীর দুরন্তপনাই কেবল ভেসে উঠছে ওর মানসপটে। বুঝি ভালোবাসার মঙ্গলময় স্পর্শে এমনি করেই মানুষ মহৎ হয়ে ওঠে, উদার হয়ে ওঠে। আজ নিজেকে ওর আকাশের মতো উদার আর সমুদ্রের মতো বিশাল মনে হচ্ছে। মনে মনে ও রফিকউদ্দিনকেও ক্ষমা করে দেয়।

আবারও একই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে ওর মস্তিস্কের জানালায় উঁকি দেয়। অপু কি আমাকে ভালোবাসে? না-ইবা বাসলো, না হয় হলোই ওয়ান সাইডেড লাভ। আজ আমার হৃদয় মনে যে পরিবর্তনের দখিনা হাওয়া বইতে শুরু করেছে, যে ইতিবাচক পরিবর্তন সুচিত হয়েছে আমার জীবনে এটাই কি এক বিরাট প্রাপ্তি নয়? এই পরিবর্তন নিশ্চয়ই কোনো স্বর্গীয় প্রেমের স্পর্শেই ঘটেছে। সেই প্রেম মিথ্যা হতে পারে না, ধোকা হতে পারে না। ওর এখন কেবলি অপুর স্পর্শ পেতে ইচ্ছে করছে, ইচ্ছে করছে ওর স্বর্গীয় দ্যুতিময় চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে। ওর স্নিগ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সারাটা দিন পার করে দিতে।

সিদ্ধান্ত নেয় অমিত, ওর সঙ্গে কথা বলা উচিত। কথাটা ভেবেই আবার দ্বিধায় পড়ে, শঙ্কায় কেঁপে ওঠে। কি কথা বলবো, কি কথা দিয়ে শুরু করবো? ওকে কি বলবো, অপু আমি তোমাকে ভালোবাসি, আই লাভ ইউ। নাহ, একেবারে বাংলা সিনেমার ডায়লগ হয়ে গেলো। দু'একটা হিন্দি সিনেমা-টিনেমা দেখলেও না হয় এর চেয়ে উন্নত কোন সংলাপ শেখা যেতো। হিন্দি সিনেমার পোকা ভাবীর পাশে বসেতো একটা সিনেমাও কোনোদিন দেখলাম না। 'কেয়ামত সে কেয়ামত তক' ছবিটা দেখার জন্য ভাবী কতো করে বললেন, কিছুতেই রাজী হলাম না। ভাবী নিশ্চয়ই জানেন, আমি মেয়েদের অপছন্দ করি। তাই আমাকে প্রেমের ছবি দেখাতে চান। অথচ আমার পছন্দ মারদাঙ্গা ছবি। প্রিয় নায়ক সিলভাস্টার

স্টালন। আজকাল নাকি আরেকটা প্রেমের ছবি খুব হিট করেছে, 'সাজান'। আজ বাসায় ফিরেই ছবিটা দেখবো, মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় অমিত।

হঠাৎ ওর রিজভীর কথা মনে পড়ে। রিজভী ওর ছোটবেলার বন্ধু। ওর নাম ছিল জামান, সামসুজ্জামান। শাহানা নামের একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে ও ক্লাশ টেনে পড়ার সময়। শাহানা ওকে রিজভী বলে ডাকতো। সেই থেকে ও রিজভী হয়ে গেল। এখনতো সারা দেশের মানুষ ওকে এই নামেই চেনে, রিজভী আহমেদ, বিখ্যাত লিরিসিস্ট। কুমার শানু থেকে শুরু করে কে-না ওর লেখা গান গেয়েছে। কৈশোরের ঘোর কাটতে না কাটতেই শাহানার সাথে ওর প্রেমের ঘুড্ডি বাকাট্টা। এবার ওর জীবনে এলো সীমা। বড় ভাই সেলিমের শ্যালিকা সীমার সাথে যখন ও চুটিয়ে প্রেম করছিলো তখন ওরা তিন বন্ধু, রিজভী, টিটু আর অমিত গাঁজা খেতে যেতো মহাখালি। ওদের আরেক বন্ধু কণ্ঠশিল্পী বাদশাহ বুলবুল তখন ওর বাবা-মা, ভাই, ভ্রাতৃবধু, দুই বোন এবং একগাদা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে মহাখালীর ঘিঞ্চি গলি ঘুপচির ভেতরে একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে ভাড়া থাকতো। মহাখালির আড্ডাটা গড়ে উঠেছিলো বুলবুলকে ঘিরেই। রিজভী কখনো গাঁজা খেতো না, কিন্তু আসরে থাকতো সবার আগে। ওর মধ্যে গাঁজার কল্কি কখনো নেশা ধরাতে পারে নি। ওর নেশা অন্য কিছুতে, প্রেমে, মেয়েদের সংস্পর্শে। বুলবুল তখনো পুরোপুরি শিল্পী হয়ে ওঠে নি, কিন্তু গান আর গাঁজা ছাড়া ও আর কিছু বুঝতো না। টিটু, অমিত আর বুলবুল যখন গাঁজার কল্কিতে দম দিয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে যেতো রিজভী তখন বুলবুলের বোন ডলির সাথে মন নেওয়া-দেওয়া করতো। এলাকায় চাউর হয়ে গেলো, টিটু ও বাড়িতে যায় ডলির জন্য। অমিত মেয়েদের ঘৃণা করে একথা জানা সত্বেও দু'চার কথা ওকেও শুনতে হতো। শুধু কথা শুনতে হতো না রিজভীকে। এসব বিষয়ে ওকে কেউ কখনো সন্দেহ করে না। কারণ ও খুবই ভদ্র ছেলে, গাঁজায় নেই, মারামারিতে নেই, মেয়ে দেখলে সিটি বাজায় না, লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকে। একদিন খবর এলো রিজভী ডলিকে নিয়ে ভেগেছে। ডলি সায়ন্তনী তখন কেবল ফুটতে শুরু করেছে। মিল্টন খন্দকারের লেখা ও সুর করা 'হে যুবক' এলবামটি মাত্র বাজারে এসেছে। সবার মুখে মুখে তখন 'রঙচটা জিনসের প্যান্ট পরা, জ্বলন্ত সিগারেট ঠোটে ধরা' 'হ্যালো ম্যাগগাইভার' এইসব গান।

এখন ওর রিজভীকেই দরকার। প্রেম সংক্রান্ত বিষয়ে ওর চেয়ে ভালো কনসালটেন্ট আর কে হতে পারে? শালা রিজভীটা কি করে যে এতো সুন্দর সুন্দর পুতুলের মতো মেয়েগুলোকে সুড়সুড় করে ঘর থেকে বের করে আনে, সেই রহস্য জানা খুবই জরুরী। অথচ ও দেখতে এমন আহামরি কিছু না। সাড়ে পাঁচফুটের কম উচ্চতা, গায়ের রঙটাও ময়লা। চেহারায় একটা টক-মিষ্টি ভাব আছে, ওই যা। তবে একটা জিনিসের তারিফ করতে হয়, কথা বলে চমৎকার, একেবারে কবিতার ভাষায়। ইউরেকা। পেয়ে গেছে অমিত। কথা বলাটা প্রাকটিস করতে হবে। নিশ্চয়ই যেসব ছেলেরা গুছিয়ে কথা বলতে পারে মেয়েরা ওদেরকেই বেশী পছন্দ করে।

রিজভীকে একটা ফোন করি। সিক্স জিরো ফাইভ সিক্স ওয়ান নাইন বাটনগুলো পুশ করতেই ওপাশ থেকে মেয়েলি কণ্ঠ ভেসে এলো।

হ্যালো।
আমি অমিত বলছি। রিজভী আছেতো?
ও অমিত ভাই, কেমন আছেন?
ভালো, তোমরা?
এই আছি একরকম। আপনার বন্ধুতো....
কি বাইরে গেছে, দোকানে?
না মানে একটু, আপনি কি একটু পরে করবেন?
কেনো? কি হয়েছে?
ও-তো এখন ইয়ে, মানে বাথরুমে।
'বাথরুমে' শব্দটা ডলি এমনভাবে উচ্চারণ করলো যেন সঙ্গে সঙ্গে ওর নাকে এসে হাগুর গন্ধ লাগলো।
ঠিক আছে ঠিক আছে....ছেড়ে দিচ্ছি। আমি একটু পরে আবার করবো।

হাত ঘড়িটায় চোখ রাখে ও। পৌনে এগারোটা। শালা এতোক্ষণে ঘুম থেকে উঠেছে। শিল্প-সাহিত্যের সাথে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে এই এক মহাসমস্যা। সারা রাত হাতি-ঘোড়া মেরে দুপুর অব্দি নাক ডেকে ঘুমানো।

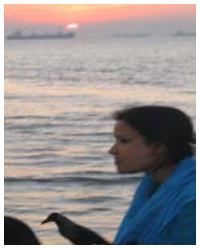

হালকা ভলিউমে ক্যাসেট প্লেয়ার বাজছে। পূরবী রায় গাইছেন,

বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছো দান
আমি দিতে এসেছি শ্রাবনের গান
মেঘের ছায়ায় অন্ধকারে রেখেছি ঢেকে তারে
এই যে আমার সুরের ক্ষেতের প্রথম সোনার ধান
আজ এনে দিলে হয়ত দিবে না কাল
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল
এ গান আমার শ্রাবনে শ্রাবনে তব বিস্মৃতিস্রোতের প্লাবনে
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী বহি তব সন্মান।।

এতোদিন অপু শুধু একটি গান শুনেছিলো। আজ শুনছে হৃদয়ের শব্দ আর তাতে সংযোজিত অনিবার্য সুরের ঝংকার। এ আর আজ কোনো গান নয়, প্রাণ বেজে উঠছে, ওর হৃদয় বেজে উঠছে, ওর জীবন বেজে উঠছে। হৃদয় উৎসারিত সুরের মূর্ছনা শতধারায় ছড়িয়ে পড়ছে আজ আকাশে বাতাশে। গানের প্রতিটি শব্দ ওর মন থেকে হৃদয়ে, হৃদয় থেকে মস্তিস্কে, মস্তিস্কের গোপন গহীনে লুকানো একটি সেলে নাম না জানা এক ওমে, উত্তাপে সৃষ্টি করছে নতুন এক তরঙ্গ, জীবনের নতুন উন্মেষ। সেখানে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হচ্ছে এক নতুন শিহরণ, জীবনের এক নতুন অনুভূতি, ভালোবাসা। বর্ষার অবিরল ধারায় এ ধরাতল যখন শুদ্ধ হচ্ছে, নির্মল হচ্ছে, তখন ভালোবাসার বর্ষাজলের অমিয় ধারায় ওর হৃদয়ের ওপর থেকে ভেসে যাচ্ছে উগ্র আধুনিকতার ঝরাপাতা, সকল সংস্কারের পচা আবর্জনা। ভালোবাসার উজ্জ্বল আলোয় ক্রমশ উদ্ভাসিত হচ্ছে ওর হৃদয়-মন। এক স্বর্গীয় দ্যুতি ওর মন থেকে দূর করে দিচ্ছে সমস্ত শঙ্কা।

সন্নাসীর মতো পা দুটো ভাঁজ করে খাটের ঠিক মাঝখানটায় একটা হালকা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে দুই চোখ বন্ধ করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে আছে অপু। ও যেন আর এখানে, এই চারদেয়ালের ভেতরে নেই। কোন সুদূরে ভেসে গেছে তা ও নিজেও জানে না। জানালার ওপাশে কাঁচের ওপর ঝড়ের দাপটে রক্তকরবীর ডাল এসে আছড়ে পড়ছে। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টির ছাট এসে জানালার কাচে ঝাপটা মারছে, এতে যে শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে তাতে ওর মগ্নতায় একটুও আঘাত হচ্ছে না বরং এই বরষার ছন্দ ওর প্রার্থনার বেদীতে অর্ঘ ঢেলে দিচ্ছে।

খটাস করে একটা শব্দ হয়ে ক্যাসেট প্লেয়ারটি বন্ধ হয়ে গেলো।

ঘোরের তার ছিঁড়ে যায় অপুর। ওর বড় বড় চোখ দুটি থেকে খানিকটা দৃষ্টি ছুঁড়ে দেয় দরোজার কাছাকাছি রাখা ওয়াডরোবের ওপর, যেখানে শব্দহীন অবস্থায় পড়ে হাসফাস করেছে একটি শব্দযন্ত্র, অপুর এই মুহূর্তেরে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু ক্যাসেট প্লেয়ারটি।

কি-রে অপু, এখনো ঘুমাস নি? এতো রাতে কেউ বসে বসে গান শোনে? নে শুয়ে পড়, গান শুনতে হয় শুয়ে শুয়ে শোন।

দেয়াল ঘড়িতে চোখ রাখে দু'বোন একসাথে, বারোটা পেরিয়ে গেছে। মৃদু ধমক দিয়ে কথা বলে মিলি। এ অধিকার ওর আছে। মিলি শুধু ওর বড় বোনই না, একাধারে মা-ও। মিলিই ওর সব। মনিরের হাত ধরে যেদিন মিলি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়, সেদিন ওর চেয়ে আর কে বেশী কস্ট পেয়েছিলো? খন্দকার সাহেবতো বলেছিলেন 'জাহান্নামে গেছে, ভুলে যাও সব'। কিন্তু ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়। আর তিনিওকি আঁড়ালে মেয়ের জন্য চোখের জল ফেলেন নি। সেই

জল আর সকলের কাছ থেকে আঁড়াল করতে পারলেও অপু তা ঠিক দেখেছিলো। আর তখনি দুজনের কান্নার দুটি গোপন প্রবাহ এক মোহনায় মিলিত হয়ে একই সাগরে দিকে ছুটে গিয়েছিলো।

মিলিই ওর সব। মিলিরও প্রাণ অপু। বিয়ের পর তিনটি মাস ওকে ছেড়ে যে কিভাবে ছিলো তা ও-ই জানে, আর জানে একজন; অপুহীন পৃথিবীতে মিলির চোখের জলে যার বুক ভিজেছে, সুখ ভিজেছে। অপুর যখন তিন বছর, মিলি তখন কলেজে উঠেছে। হঠাৎ একদিন সকালে ওদের মা আর ঘুম থেকে ওঠেন নি, এরপর তিনি আর কোনোদিনই ওঠেন নি। ডাক্তার জানালেন ম্যাসিভ হার্ট এটাক। মাঝখানে আর কোন ভাই-বোন নেই ওদের। মিলি শুধু মায়ের দায়িত্ব নিয়েই ওকে বড় করে তোলে নি, হয়ে উঠেছে ওর বন্ধুও, জিগিরি দোস্ত। অসম বয়সের এই দুবোন যেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বন্ধুযুগল, সকল বন্ধুর ঈর্ষাতীর্থ। বয়সের এই পার্থক্য কিংবা সহোদরা হওয়া, এর কোনোটাই ওদের খোলামেলা, অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের অন্তরায় হতে পারে নি। দুবোনই মনের দিক থেকে একদম সোজা-সাপটা, শাদা দিলের মানুষ। তবে চাল-চলনে রয়েছে আসমান-জমিন ফারাক, দুজনের অবস্থান দুই মেরুতে। মিলি যেমন টিপিক্যাল বাঙালী রমনী, অপু ঠিক তার উল্টো। মিলির প্রিয় পোশাক শাড়ি, অপুর প্যান্ট-শার্ট। অবশ্য অপুকে এভাবে মিলিই গড়ে তুলেছে। ওদের কোনো ভাই নেই বলে, ভাইয়ের অভাব ভুলতে অপুকে মিলি ছোটবেলা থেকেই ছেলেদের পোশাক পরাতো। অপু নামটাও মিলিরই দেয়া। শুধু তাই না, মিলি ওকে বেশীরভাগ সময়ই ভাই বলে ডাকে।

ওটা অন করে দাও

সেনাপ্রধানের মতো নির্দেশের সুর অপুর কণ্ঠে। কথাটা বলেই কটমট করে তাকায় ও মিলির দিকে। ডান হাতের তর্জনীটা তখনো ক্যাসেট প্লেয়ারটির দিকে ধরা আছে।

এখন কটা বাজে?

অপুর ঠিক বিপরীত সুরে খুব নরোম গলায় প্রশ্ন করে মিলি।

যতোটাই বাজুক। তোমাকে বলেছি প্লেয়ারটি অন করো, নইলে কিন্তু খবর আছে আপু।

অপু।

চাপা অথচ বেশ তিব্র একটা ধমক দেয় মিলি।

বাবা অসুস্থ।

পরক্ষণেই আবার গলাটা নরোম করে ও।

আপু, শব্দটা বাবার ঘরে যায় না।

বেশ আব্দারের সুর অপুর কণ্ঠে, আর তখনি ওর কণ্ঠে নাকি সুরের একটা আহ্লাদি ভাব আসে।

না যাক। এখন সাড়ে বারোটা বাজে। কাল তোর ক্লাস নেই?

আছে। বিকেলে।

রাত জাগলে শরীর খারাপ করবে ভাই। যা শুয়ে পড়।

কথাটা বলেই খাটের ওপর উঠে আসে মিলি। সস্নেহে হাত রাখে অপুর কপালে।

এই তো, গা গরম হয়ে উঠেছে। শিগগির শুয়ে পড়তো, লক্ষী ভাই আমার, মশারী খাটিয়ে দেবো?

না আমি নিজেই খাটিয়ে নেবো। আপু তুমি এখন যাও না প্লিজ। আমারওতো একটা স্বাধীনতা আছে না-কি? প্রাইভেসি-ট্রাইভেসি বলে কিছু মানো তো?

ও ব্বাবাহ.....

অপুকে ছেড়ে দিয়ে হাত দুটো পেছনে এনে হাঁটু গেঁড়ে বিছানার ওপর অর্ধদন্ডায়মান মিলি সেনা সদস্যদের মতো আরামে দাঁড়ায়।

ভাইটি আমার বেশ বড় হয়ে গেছেতো!

তো, সারা জীবন কি ছোটই থাকবো?

তা এই বড় হওয়াটা কবে থেকে শুনি?

মিলি এখন তাকিয়ে আছে অপুর চোখের দিকে। চোখ নামায় অপু। আস্তে করে, খুব মৃদুস্বরে বলে,

আজ সকাল থেকে।

ততোক্ষণে খাট থেকে নেমে গেছে মিলি। ও এখন ওয়াডরোবের ভেতর থেকে মশারী বের করে মশারীর ভাঁজ খুলছে। অপুও বিছানা থেকে নেমে আসে। ঝড়ের দাপট আরো বেড়েছে। বিদ্যুচ্চমকের আলোয় এক ঝলকের জন্য বাইরের অন্ধকার পৃথিবীটা আলোকিত হয়। সেই আলোয় অপু দেখতে পায় আমগাছের একটা মোটা ডাল ভেঙ্গে জানালার ওপর

পড়ে আছে, জানালার অর্ধেকটা কাচ তাতে ঢাকা পড়েছে। সাথে সাথে কাছে কোথাও বাজ পড়ে। প্রচন্ড শব্দে কেঁপে ওঠে ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র, জানালার কাচ।

এ সময় অপু লিলির গলা জড়িয়ে ধরে হৈ চৈ শুরু করে দেয়। ভয়ে না আনন্দে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। চিৎকার করতে করতে একসময় নাচতে শুরু করে ও। এই মধ্যরাতে যে এভাবে নাচনাচি করা, চেচামিচি করাটা অনুচিত তা ওর ধর্তব্যের মধ্যেই যেন নেই। ওর হৃদয়ে এখন অন্য বরষা, বজ্রপাতে সব লন্ডভন্ড। পৃথিবীর অন্য সকল বিষয়গুলো এখন খুবই তুচ্ছ ওর কাছে।

এই থাম, থাম বলছি। কি-রে, কি হয়েছে, হয়েছেটা কি তোর? পাগল হলি নাকি?

অপুর উচ্ছাসকে থামাতে পারে না মিলি। এই উচ্ছাসকে কি থামানো যায়, না থামাতে পেরেছে কেউ কোনোকালে। শাসন-বারণহীন মুক্ত বিহঙ্গের মতো এই ঝড়ের রাতে ওর আকাশে ডানা মেলে উড়ে যেতে ইচ্ছে করছে, গন্তব্যহীন কোনো অজানায়।

আসল ঘটনাটা কি বল দেখি, এই অপু।

বাঁ হাতটা আলতো করে অপুর গালে ছোঁয়ায় মিলি। তারপর ঠিক ওর উল্টোদিকে ঘুরে প্রশ্ন করে,

কারো প্রেমে-ট্রেমে পড়িস নি তো?

প্রশ্নটা কি ও অপুকে করলো, না নিজেকে করলো; না কি কাউকেই করে নি, এমনি এমনি বললো, একটা কথার কথা? এর যে কোনোটাই হতে পারে। তবে কথাটা বলেই নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মিলি। কিছু একটা রেসপন্স প্রত্যাশা করছে অপুর কাছ থেকে। ওপাশ থেকে কোনো সাড়া-শব্দ আসছে না দেখে আস্তে আস্তে হেঁটে অপুকে পাশ কাটিয়ে, যেন ওকে দেখতেই পায় নি, এরকমভাবে জানালার কাছে এগিয়ে যায় মিলি। তখন আবারো একটা বিদ্যুৎ চমকায় আকাশে। মিলি দেখে আমগাছের ভাঙা ডালটা কাত হয়ে পড়ে আছে বাগানের ওপর। ওর প্রিয় রঙ্গন আর নয়নতারার চারাগুলো বুঝি গেলো।

মাথা নিচু করে দুচোখ মুদে লজ্জায় দুহাতের করতলে মুখ লুকিয়ে রেখেছে অপু। মিলির কাছে কিসের এতো লজ্জা ওর। মিলিতো শুধু ওর বড় বোনই না, বেষ্ট ফ্রেন্ডও। মনিরের সাথে প্রেম পর্বের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তও নেই যা মিলি ওর সাথে শেয়ার করে নি। ওরই বয়েসী রিণা, ওইতো দুটো বাড়ি পরেই যে তালগাছটা আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, ওই তালগাছঅলা বাড়ির নুরু হাজীর মেয়ে রিণা, ওদেরই গৃহশিক্ষক মিজানুর রহমানের সাথে পালিয়ে গেলো। এ নিয়ে সেদিন ছাদে দাঁড়িয়ে তালগাছটার দিকে তাকিয়ে থেকে কতো গল্প করেছে দুবোন, পুরো একটা বিকেল পার করে দিয়েছে। এর পূর্বাপর কার্যকারণ নিয়েও কথা বলেছে ওরা, বলেছে সম্ভাব্য পরিণতির কথাও। অথচ আজ এই 'প্রেম' শব্দটিতে ও এমন গুটিয়ে যাচ্ছে কেনো? কিসের এতো লজ্জা? অপুর বুকের ভেতর হৃৎপিন্ডটা ধরাস ধরাস করছে। ভয়ে না লজ্জায়, বুঝতে পারে না অপু। ও কি ইতোমধ্যেই এর পরিণতি ভাবতে শুরু করেছে। মনিরের সাথে মিলির বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াতে এ সংসারে যে অশান্তির অন্ধকার নেমে এসেছিলো, ও কি একই রকম সমূহ অশুভ মেঘের অশঙ্কায় কেঁপে উঠছে? অপু এটুকু বেশ বুঝতে পারে ওর ভেতরে ঠিক ওইরকমই একটা কিছু ঘটে যাচ্ছে। তবে প্রচন্ড ওলট-পালটে ভাঙনই যে শুধু শুরু হয়েছে তা-ই না। এই খরস্রোতা নদীর অন্য পাড়ে কোথাও জেগে উঠছে নতুন চর। সেই চরে সবুজ ঘাসের ডগা লকলক করে দুলছে বর্ষার ভেজা বাতাশে।

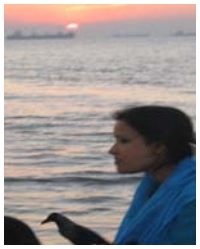

দিনের প্রথম কাজটি করার জন্য বাথরুমে ঢোকে অমিত। বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ আসছে। অনেকক্ষণ ফ্লাশ না টানলে এই গন্ধটা হয়। ফ্লাশ টানতে গিয়ে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় ওর, পানি নেই। বড় ড্রামটার পানিও তলানীতে গিয়ে ঠেকেছে, মগ দিয়ে তোলা মুশকিল। অন্য সময় হলে এটা সহ্য হয়, সাত সকালে ঘুম থেকে উঠেই যদি বাথরুম সংক্রান্ত একটা যুদ্ধে নামতে হয় তাহলে কারোরই মেজাজ ঠিক থাকার কথা না। অমিতেরও মেজাজ ঠিক নেই। বাড়িঅলা বেটা হাঁড়ে হাঁড়ে বজ্জাত, লিটার মেপে পানি তোলে। কিছু বলতে গেলেই কঞ্জুসটা দাঁত বের করে হাসে, মোলায়েম একটা হাসি দিয়ে বাঁ হাতে দাঁড়িগুলো খিলাল করে। এসব দেখলে দ্বিতীয় দফায় মেজাজ খারাপ হয়। লোকটার কাজ কর্ম দেখলে মনে হয় ভাড়াটিয়াদের ক্ষেপাতে পারলেই যেন তার আনন্দ। পাঁচতলার ছাদে পানি তুলতে মিনিটে কয়টাকা বিদ্যুৎ খরচ হয়, পাই পাই করে সে হিসেবটা শুনিয়ে দেয়। আর একটু সুযোগ পেলেই জুলাই মাসে বাড়িভাড়া বাড়ানোর আগাম খবরটা দিতে একটুও ভুল করে না। এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলে শ্রোতাকে দাঁড় করিয়ে রেখেই ধীরে ধীরে বাথরুমে ঢুকে যায়। বাথরুমের দরোজা খোলাই থাকে। তিনি বেসিনের ওপর হাসের পায়খানা করার মতো পুচ করে পানের পিক ফেলেন। নোংরা হয়ে যাওয়া বেসিনের ওপর বালতি থেকে ডাঁট ভাঙা প্লাস্টিকের সবুজ মগটা দিয়ে খানিকটা পানি তুলে ছিটিয়ে দেন। এতে বেসিনটা আরো বিশ্রী দেখায়। নিচু হয়ে বালতি থেকে পানি তুলবার সময় তার শাদা লুঙ্গির নিচের অংশটা স্যাতস্যাতে বাথরুমের ফ্লোরে লুটোপুটি খায়, ভিজে যায়। এতে বুঝি তার কিছুটা মেজাজ খারাপ হয়। তিনি খিটখিটে মেজাজ নিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসেন। তারপর বলেন, যান, কমোডে বইসা পড়েন। মেশিন চালু দিতাছি। এ কথা বলার সময় লোকটার মুখ থেকে তাম্বুলের রস ঠোটের কোনা দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। তাতে ওর দাড়ি ভেজে, হাতাঅলা শাদা গেঞ্জির বুক ভিজে লাল হয়ে যায়।

মেশিন তিনি চালু দেন ঠিকই। পানিও আসে। কিন্তু ততোক্ষণে দূর্গন্ধে নাড়ি-ভূড়ি বেরিয়ে আসতে চায়। দু'একটা আরশোলা কমোডের মধ্যে হাঁটাহাঁটিও শুরু করে দেয়। গা ঘিন ঘিন করে।

তারপরেও মোখলেছউদ্দিনকে অমিতের বেশ পছন্দই হয়। বাড়িঅলাতো ব্যাবসায়ী। ব্যাবসায়ী তার ব্যাবসায়ের লাভ-ক্ষতির হিসেব করবে এটাই স্বাভাবিক। এতে দোষের কিছু নাই। বাড়িঅলা হিসাবে পছন্দ না হলেও মানুষ হিসাবে পছন্দ হয়। অমিতের সঙ্গে এক সকালে অনেক গল্প করেছে মোখলেছউদ্দিন। এসব গল্পের একটাই সারবস্তু। জগতে টাকা ছাড়া অন্য কোনো পদার্থের তেমন কোনো মূল্য নেই।

কলিং বেলের শব্দ শুনে অমিত নিজেই দরোজা খোলে সেদিন

কেমন আছো বাবা?

মোখলেছউদ্দিনের কণ্ঠে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুর, দরদি কণ্ঠ।

জ্বী ভালো। আজতো একত্রিশ তারিখ চাচা। একত্রিশে ডিসেম্বর। ডিসেম্বর মাস একত্রিশ দিনে হয়। এক তারিখ আসতে আরো একদিন বাকী। তাছাড়া আপনার আসারতো কোনো প্রয়োজন দেখি না। ভাইয়া নিজে গিয়েইতো প্রতি মাসের এক তারিখে বাড়ি ভাড়া দিয়ে আসেন।

মোখলেছউদ্দিন লজ্জা লজ্জা মুখ করে অমিতের দিকে তাকিয়ে থাকে। কোনো কথা বলে না। লোকটার কি কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে? এতোগুলো কথা শোনার পরও কিছুই বলছে না। এটা একটা আস্বাভাবিক ঘটনা। অমিত এই প্রথম এই লোককে লজ্জা পেতে দেখলো। লজ্জা পাওয়ায় ওর কাঁচা-পাকা দাড়িতে শোভিত মেদবহুল মুখটিকে বড় অদ্ভুত দেখাচ্ছে। কেমন একটা নূরানী চেহারা হয়েছে, মায়া মায়া ভাব এসেছে।

যুবক বয়সের ছেলে-মেয়েরা খুব সহজেই কোনো কিছুতে বিস্মিত হয় না। বিস্ময়ে অবাক হয় শিশুরা। যুবক বয়স হলো আবিস্কারের বয়স, বিস্ময়কে জয় করার বয়স। কিন্তু অমিত শুধু বিস্মিতই হয় না, ওর জীবনে বিস্মিত হবার সেরা ঘটনাটি ঘটে। মোখলেছউদ্দিন কোনো কথা না বলে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন। এই বয়সের একজন মানুষের মধ্যে যে কেঁদে ফেলবার মতো এতোটা আবেগ থাকতে পারে এটা অমিতের ধারনার বাইরে ছিলো। অমিত খুবই বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। ভাইয়া কিংবা ভাবী এসে পড়লে একটা যাচ্ছেতাই কান্ড ঘটে যাবে। নিজেকে ওর খুব অপরাধী মনে হয়। এতোটা রূঢ় হওয়া ওর উচিত হয় নি। কান্না সংবরণ করার কোনো চেষ্টাও করছেন না মোখলেছউদ্দিন। চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি পড়ছে। আর তিনি তাকিয়ে আছেন অমিতের মুখের দিকে। এতে অমিতের অপরাধবোধটা আরো বেড়ে যায়। মোখলেছউদ্দিনের ঠোঁট এবং চোখের নিচের অংশটা কুচকে গিয়ে ওর মুখটা বেশ বিকৃত হয়ে আছে। তিনি মোটা ফ্রেমের চশমাটা খুলে ঝাপসা হয়ে যাওয়া চশমার কাচ পাঞ্জাবীর কোনা দিয়ে ঘষে ঘষে পরিস্কার করেন। যেন চোখ দিয়ে পানি আসাটা হয়েছে চশমার দোষ।

তোমরা আমাকে খুব নিকৃষ্ট মানুষ ভাবো, আমি বাড়ি ভাড়া দিয়ে খাই।

অমিতের দিকে না তাকিয়ে, চশমার কাচের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন মোখলেছউদ্দিন। অমিত একটা মওকা পায় কথা বলার, যদি এতে ভদ্রলোকের চোখের জল থামানো যায়।

তা ভাববো কেনো চাচা। বাড়ি ভাড়া দেওয়াটা অন্যায় কিছু না। যাদের বাড়ি আছে, সবাই দেয়। আমাদের থাকলে আমরাও দিতাম। চাচা ঘরে আসেন, বসে কথা বলি।

জ্বি না বাবজান। আমি ঘরে যাবো না। তুমি একটু ওপরে আসবা, তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।

জ্বি আসবো এক সময়।

এক সময় না, এখনি আসো।

আমাকে যে অফিসে যেতে হবে চাচা।

একদিন অফিসে দেরী করে গেলে কিছু হয় না।

কথাটা বলেই সিঁড়িতে পা রাখেন মোখলেছউদ্দিন, পেছনে আর ফিরে তাকান না। তিনটি সিঁড়ি ভেঙেই তিনি আবার ফিরে আসেন। অমিত ততোক্ষণে দরোজা বন্ধ করে দিয়েছে। আবার কলিং বেল বেজে ওঠে, দরোজা খোলে অমিত।

আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি। শোন বাবা, আমি বাড়ি ভাড়া চাইতে আসি নাই। পাঁচ বছর আগে আজকের দিনে আমার বড় সন্তান আলো মারা গেছে। তোমাকে দেখলে আমার আলোর কথা মনে পড়ে। তাই তোমাকে দেখতে এসেছিলাম।

অন্যের ছেলে কখনো নিজের ছেলে হয় না। অমিতও কখনো আলো হবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে মোখলেছউদ্দিনের পিতৃহৃদয়ে অমিত আলো হয়ে ধরা দেয়।

মানুষটির প্রতি এক ধরণের মমতার অনুভূতি টের পায় অমিত। অপরাধবোধের প্রায়শ্চিত্য করার জন্যই হোক আর মমতার টানেই হোক দশ মিনিটের মাথায় মোখলেছউদ্দিনের ফ্লাটে গিয়ে উপস্থিত হয় অমিত।। মোখলেছউদ্দিন তিনতলায় থাকেন, পুরো ফ্লোরে একটিই ফ্লাট। অমিতরা থাকে দোতলায়। দোতলাসহ অন্যান্য ফ্লোরগুলোতে দুটি করে ফ্ল্যাট।

তিনতলায় গিয়ে অমিত তাজ্জব বনে যায়। মানুষ চিরকাল পৃথিবীতে থাকতে আসে না। মানুষের জন্ম হয় মৃত্যুবরণ করার জন্য। একদিন না একদিন সবাইকেই যেতে হবে। এই ভদ্রলোকের ছেলে না হয় ক'দিন আগেই গেছে। অল্প বয়সে অনেকেরই মেয়ে-ছেলে মারা যায়। যুবক বয়সের ছেলে মরে গেলে শোকটা দীর্ঘদিন থাকে। কিন্তু মোখলেছউদ্দিন পরিবারে আলোর মৃত্যুশোক একটা স্থায়ী আসন পেতে বসে আছে। ড্রয়িংরুমের চারপাশের দেয়ালে আলোর একুশটা ছবি রূপার ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো। প্রতিটা ছবিই তাজা ফুলের মালায় শোভিত, বেলী ফুলের মালা। পুরো ঘরে বেলী ফুলের একটা মৃদু সুবাস ছড়িয়ে আছে। নিজের চেহারা সব মানুষ ভালো করে চিনতে পারে না। কিন্তু অমিত পারে। সাধারণত যারা নিজেদেরকে সুদর্শন মনে করে তারা ঘন ঘন আয়নায় নিজের মুখ দেখে। রোজ বিকাল-সকাল বেশ ক'বার আয়না দেখার ফলে অমিত নিজের চেহারা চেনে, খুব ভালো করেই চেনে। সেই চেহারার সঙ্গে এই ঘরের দেয়ালে ঝোলানো একুশটি ছবির কোনো একটিরও মিল নেই। তারপরও মোখলেছউদ্দিন পরিবারের চোখে অমিত আলো হয়ে গেলো।

চাচা বলেন, কি কথা বলবেন।

তেমন কোনো কথা না বাবা। তুমি একটু বসো, তোমাকে দেখি।

অমিতের ইচ্ছে হয় বলে, দেখার বস্তু হিসাবে ছেলেদের কোনো কদর নেই দুনিয়াতে। দেখতে হয় মেয়েদের। একটি সুন্দরী মেয়েকে সামনে বসিয়ে রেখে জগতের মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। ক্লান্ত হয় না, বিরক্ত হয় না। মোখলেছউদ্দিনকে অবশ্য তেমন কিছুই বলতে পারে না অমিত। এতে তিনি আবারও কেঁদে ফেলতে পারেন। নিজের বাড়িতে স্ত্রী-কণ্যার সামনে কেঁদে ফেললে কেলেঙ্কারী কান্ড হয়ে যাবে।

চাচা আলো কি করে মারা গেলো সেই ঘটনাটা বলেন।

প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য এমন একটা কথা কেনো বললো, ভেবে শঙ্কিত হয় অমিত। সন্তানের মৃত্যুদৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি নিশ্চয়ই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়বেন এবং আবারো কাঁদবেন।

আজ না বাবা। তোমাকে আরেকদিন বলবো। আজ তোমাকে অন্য একটি ঘটনা বলি। আলোর জন্মের ঘটনা।

জ্বী বলেন।

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অমিত। বাঁচা গেলো।

আমি তখন বেকার। পড়ালেখা খুব একটা করতে পারি নাই। থার্ড ডিভিশনে আই,এ, পাশ করায় পিতা আর বি,এ, ক্লাসে ভর্তি করালেন না। পড়ালেখা বন্ধ হয়ে গেলো। ছেলে সংসারী হলে আয়-রোজগার করবে এই ভরসায় আব্বা আমার বিয়ে দিয়ে দিলেন। বেকার জীবন, তোমার চাচীকে খাওয়াবো কি? আমাদের ছিলো টানাটানির সংসার। তাই তোমার চাচীকে তার বাপের বাড়িতেই রাখতে হলো। বুঝলে বাবা এ সংসারে টাকাপয়সাহীন মানুষ সর্বার্থেই অর্থহীন। পকেটে টাকা না থাকলে বেঁচে থাকারও কোনো অর্থ হয় না।

কথাটা বলেই একটা ম্যারাথন নিঃশ্বাস ছাড়েন মোখলেছউদ্দিন।

দুই বছর সে তার বাপের বাড়িতেই থাকে। ঢাকা শহরে আমাবস্যা-পূর্ণিমা টের পাওয়া যায় না। সেদিন ছিলো জোছনা রাত। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। স্বপ্নে দেখলাম, ঘন কুয়াশার ভিতর দিয়ে একটা বাঁশের সাঁকো পার হচ্ছি আমরা দু'জন, তোমার চাচী আর আমি। হঠাৎ পা ফসকে তোমার চাচী নিচে পড়ে গেলো। নিচে নর্দমার নোংরা পানি। আমি তখন ঢাকার সেগুনবাগিচায় আমার মেজো মামার বাড়িতে আশ্রিত। অনেকটা চাকর-বাকরের মতো আছি। তবে পদমর্যাদায় আমাকে আত্মীয় বলতে ওরা কখনো কার্পণ্য করতো না। ঘুম ভেঙে গেলে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো। সোজা খালি গায়ে, খালি পায়ে ছাদে চলে যাই। ছাদে গিয়ে দেখি আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। মাঝরাতের নীরব ঢাকা শহর জোছনায় গোসল করছে। কী তীব্র নীল জোছনা। চাঁদের আলো যে এতো তীব্র হতে পারে আমার আগে জানা ছিলো না। আমি তখন পাগলের মতো গলা ছেড়ে গান গাইতে শুরু করলাম,

'আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে'

পরদিন সকালে আমার ছোট শালা খবর নিয়ে এলো, ওর ভাগ্নে হয়েছে। হয়েছে গত রাতে, রাত তিনটা সময়। ঠিক ওই সময়টাতেই আমি উদোম গায়ে ছাদে গান গাইছিলাম। সেদিন ছিলো ১৯৬৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার দিবাগত রাত। আমার এই তেপ্পান্ন বছরের জীবনে এতো খুশি আমি আর কোনোদিন হই নাই। প্রথম সন্তানের জন্মের খবর একজন বাবার কাছে কী-যে আনন্দের তা আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না। তোমার যখন সন্তান হবে, তখন বুঝতে পারবে। আমি তখনি ছেলের নাম ঠিক করে ফেললাম, আলো। যার জন্মের সময় পৃথিবী আলোর বন্যায় ভাসছিলো, তার নাম আর কি হতে পারে।

চাচা আজ তাহলে উঠি?

বসো বাবা। এতো উঠি উঠি করছো কেনো? একটা কিছু না খেয়েতো যেতে পারবে না। মা ফাতেমা আমাদের কিছু নাস্তা পানি দাও।

নাস্তা আনতে মোখলেছউদ্দিন নিজেই উঠে গেলেন। আর অমিত তখন ভাবছে আলোর জন্মের দিনটির কথা। ১৯৬৮-র ১০ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার দিবাগত রাত। আলোর বন্যায় ভাসছিলো ঢাকা শহর। হ্যাঁ, সেই জোছনা রাতেই অমিতের জন্ম হয়েছে। ও কি এই কথাটা বলবে মোখলেছউদ্দিনকে? সিদ্ধান্ত নিতে পারে না অমিত।

ট্রে ভর্তি প্রচুর খাবার নিয়ে ঘরে ঢোকে ফাতেমা। পেছনে পেছনে ঢোকেন মোখলেছউদ্দিন। ফাতেমা মোখলেছউদ্দিনের একমাত্র মেয়ে। অসম্ভব রূপবতী এবং স্বাস্থবতী এই মেয়েটিকে অমিত আগেও দেখেছে তবে কখনো

কথা বলে নি। শৈশব থেকে উঠে আসা মুনা আন্টি বিষয়ক ভয়টাই ওকে কথা বলতে দেয় নি। শৈশবের স্মৃতি মানুষ খুব সহজে ভুলতে পারে না। পঁচিশ বছর বয়সের পরে মেমোরি সেলে কোনো কিছু ঢোকানো যেমন কঠিন, তার চেয়ে বেশী কঠিন শৈশবের কোনো স্মৃতি মেমোরি সেল থেকে বের করে দেওয়া। শৈশবের অসংখ্য স্মৃতির মধ্যে ছয়/সাতজন কিশোরীর সামনে ওকে নেংটো করে ফেলার মতো ভয়াবয় এবং লজ্জার স্মৃতি ওর আর একটিও নেই। মনে হলে এখনো লজ্জায় মরে যায় অমিত, মুখ লুকাতে চায় তাবৎ নারী জাতির কাছ থেকে। ওর কেবলি মনে হয় ওই ছয়/সাতজন কিশোরীই কোনো এক অলৌকিক উপায়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময় এবং ওদের মধ্য থেকেই তৈরী হয়েছে তাবৎ নারীজাতি। কি নিষ্ঠুর ছিলো সেই কিশোরীগুলি। অথচ পৃথিবীর মানুষ ওদেরকেই বলে স্নিগ্ধ, কোমল, তুলনা করে ফুলের সাথে। একটি পাঁচ বছরের শিশুমনে কী তীব্র অপমানবোধ সেদিন জন্মেছিলো, পৃথিবীর মানুষ তা জানে না। এর খেসারত বাইশ বছর ধরে দিচ্ছে অমিত। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই শিখেছে ও, শিশুদের নিয়ে তামাশা করা একটি গর্হিত অন্যায়। শিশুরা মানুষ, খেলার পুতুল নয়।

স্লামালেকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম।

নিন।

ট্রেটা টেবিলের ওপর রেখে অমিতের দিকে একটি সিরামিকের হাফ প্লেট এগিয়ে দেয় ফাতেমা।

নিচ্ছি।

ওর হয়ত উচিত ছিলো বলা, আপনিও বসুন না। কিন্তু অমিত তা বলে না। বরং মেয়েটি দ্রুত বিদায় হলেই ভালো। অমিতের বলা না বলায় কিছুই আসে যায় না, কারণ এটা ফাতেমাদের বাসা, আমিতদের না। ফাতেমা বাবার পাশে বসে পড়লো।

বাবা তুমিও নাও।

মেয়েটির আচরণই বলে দিচ্ছে, ঘর কণ্যার কাজে ইতোমধ্যেই সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছে।

না-রে মা, আমি খাব না। আলোকে দে। আমার আলোর খুব প্রিয় পাটিসাপটা পিঠা। খাও বাবা।

মোখলেছউদ্দিন অমিতের প্লেটে আরো একটি পিঠা তুলে দেয়। অমিত হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকে সামনের জানালা দিয়ে খোলা আকাশের দিকে।

আপনি কিছু মনে করবেন না প্লিজ। আপনারাতো নতুন এসেছেন, তাই জানেন না। প্রতি বছর এই দিনটা এলে বাবা কেমন এবনরমাল হয়ে যান। বোধ হয় প্রকৃতিই বাবাকে জানান দেয় দিনটা এসেছে। সারাদিন খোঁজাখুঁজি করে বিকেলে ভাইয়ার বয়েসী কাউকে বাসায় নিয়ে আসেন। অথচ মজার ব্যাপার কি জানেন, পরদিন সকালে এই দিনের যাবতীয় ঘটনা তিনি ভুলে যান। এই যে দেখছেন পাটিসাপটা পিঠা। প্রতি বছর একত্রিশে ডিসেম্বরে এই পিঠা আমাদের ঘরে তৈরী হয়। ভাইয়ার প্রিয় খাবার।

খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলে ফাতেমা। কোন শঙ্কা, দ্বিধা, জড়তা নেই। মোখলেছউদ্দিন যেন এসবের কিছুই শুনছেন না। তসবীর দানায় সন্তানের বেহেশত খুঁজছেন।

আশ্চর্য।

প্লেটের দিকে তাকিয়ে শব্দটা উচ্চারণ করে অমিত।

হ্যাঁ, আশ্চর্য। খুবই আশ্চর্য ব্যাপার। ভাইয়াকে বাবা কি-যে ভালোবাসতেন বলে বোঝানো যাবে না।

দূর্গন্ধ ঠেলে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে অমিত।

তিনতলার কলিংবেলে চাপ দিতেই ফাতেমা বেরিয়ে আসে।

বাথরুমে পানি নেই, মেশিন ছাড়তে হবে।

ফাতেমার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে অমিত, হাসি হাসি মুখ। ওর মুখে আর বিরক্তি ভাবটা নেই। ফাতেমাকে দেখলে আগে যেমন আঁতকে উঠতো, সেই অবস্থাটাও আর নেই। বরং নারীর প্রতি পুরুষের যে সহজাত আকর্ষণ, যে টান থাকে, সেটাই ও অনুভব করছে।

ও, আচ্ছা। ভেতরে আসেন না অমিত ভাই। এক্ষুণি মেশিন ছেড়ে দিচ্ছি।

না, এখন আসবো না। এখনোতো মুখ ধুই নি, দাঁত ব্রাশ করি নি। কিছু খেতে পারবো না। আর খেতে না পারলে কারো বাসায় গিয়ে কি লাভ?

অমিতের কথা শুনে ফাতেমা হেসে ফেলে। খুব উচ্ছসিত হাসি। হাসার সময় ওর, কিঞ্চিৎ মোটার ধাচে, শরীরটা দুলে উঠে। অমিত মজা পায় ওর হাসি দেখে। হাসলে মানুষকে অনেক সহজ লাগে। মানুষের বন্ধ দরোজাগুলো খুলে যায়। ফাতেমা ভাবছে জগতে কিছু কিছু মানুষ থাকে যাদের কথা শুনে হাসতে হয়। খুব সিরিয়াস কথাকেও তারা এমনভাবে বলে যা শুনে না হেসে পারা যায় না। অমিতকে ফাতেমার সেই ধরনের মানুষ মনে হয়। দুঃখ কষ্ট বোধ হয় এদেরকে ছুঁতে পারে না। কিংবা এ-ও হতে পারে, এদের দুঃখ ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশী। এই প্রথম অমিত ফাতেমার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বললো। অমিতের হঠাৎ এই পরিবর্তনে একটুও অবাক হয় না ফাতেমা। অমিতের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সনাক্ত করেছে, এ ধরনের মানুষের হঠাৎ হঠাৎ এরকম বদলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। এতে আতঙ্কিত, বিচলিত বা উদ্বেলিত হওয়ার কিছু নেই।

নাস্তার টেবিলে বসে অপুর কথা ভাবতে শুরু করে অমিত। আর তখনি ওর সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। একটা ঝড় ওঠে। সেই ঝড়ে ফলবতী বৃক্ষের ডাল ভেঙে পড়ে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। অরণ্যে বাজ পড়ে। সেখানে আগুন লাগে। আগুনে বন পোড়ে, মাঠ পোড়ে। তারপর বৃষ্টি হয়। খরাক্রান্ত মাটিতে তুমুল বৃষ্টিপাত। নতুন ফসলের চারা গজায়। দখিনা বাতাশে জড়াজড়ি করে দোল খায় নতুন ফসল। বিস্তৃত ফসলের মাঠে কৃষকের পবিত্র হাসি। সেই হাসির ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে অমিতের হৃদয়ে।

গতকাল সকালের ঘটনাটিকে ও বার বার রিওয়ান্ড করে দেখতে থাকে।

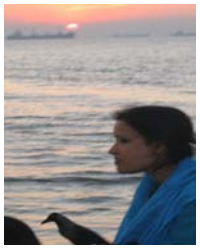

তিনদিন অবিরাম বর্ষণের পর প্রকৃতি এখন হাসছে। গনগনে রোদে পুড়ছে ঢাকা শহর। বাতাশে ধুলার কোনো আবরণ নেই বলে সূর্যটা সরাসরি এসে গায়ে লাগছে। চামড়া পুড়ে যাচ্ছে, সিগারেটের ছ্যাকার মতো লাগছে। পথের ওপর তৈরী হওয়া খানাখন্দে কর্দমাক্ত নোংরা পানি জমে আছে। একটি মিনিবাসের চাকা এরকম একটা গর্তে আছড়ে পড়তেই ছপাৎ করে এক পশলা নোংরা পানি ছিটকে এসে অপুর জামা কাপড় ভিজিয়ে দিলো। আজকাল ভার্সিটির বাসগুলো একদম টাইম মেন্টেইন করে না। কথাটা ভাবতে না ভাবতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের লাল বাসটি ওর সামনে এসে দাঁড়ালো। দশ মিনিট লেইট। ওকে তুলেই বাসটি উল্টোদিকে ঘোরার জন্য পিছাতে গিয়ে রাস্তার ওপর একটা অহেতুক জ্যাম তৈরী করে ফেললো। আর অধৈর্য বাঙালী পুরুষেরা বুদ্ধি উজাড় করে এলোপাথারী উপদেশবাক্য ছুঁড়ে দিতে লাগলো। কে কাকে উপদেশ দিচ্ছে, কি উপদেশ দিচ্ছে, কেউ কারো কথা শুনছে কি-না এ নিয়ে কেউ বদার করছে না। যেন কিছু একটা বলতে পারলেই জিতে গেলাম, এইরকম একটা খেলা শুরু হয়ে গেলো। রিক্সার টুংটাং, বেবিটেক্সি, মিনিবাস, ট্রেম্পুর হর্ণ শব্দদূষণের সর্বোচ্চ মাত্রা অতিক্রম করলো।

এক অধৈর্য ছাত্রও রেগে গেলো।

বাস ঘুরাইলেন ক্যা মামু?

মৌচাকের সামনে কোমর পানি মামা, ওইদিকে যাওন যাইবো না। উল্টা ঘুইরা নতুন বাজার দিয়া যাওন লাগবো।

ড্রাইভারের কৈফিয়ত

রামপুরার ছাত্র-ছাত্রী?

ড্রাইভার চুপ।

আরেকটি মেয়ে গজরায়

ইচ্ছামতো চলবে, মগের মুল্লুক। ওরা অপেক্ষা করবে না?

মেয়েটির কোনো প্রিয়জন রামপুরায়, রোদমাথায় দাঁড়িয়ে আছে হয়ত।

এরপর পুরো বাসে একটা গুঞ্জন ওঠে। গুঞ্জনটা একসময় ফেটে পড়ে হৈ চৈ চেচামেচিতে। শুরু হয় সরব বিতর্ক। একটি ছাত্র, যার মাথার লম্বা চুলগুলো ঘাড়ের নিচে দোল খায়, যার গায়ে লাল শার্ট, ডান হাতে সোনার ব্রেসলেট, বুকের বোতাম খোলা, যার পরনে রঙচটা জিনস, পকেটে ট্রিপল ফাইভের প্যাকেট, সিগারেটের প্যাকেটের ভেতরেই, একপাশে মাছের লেজাকৃতির দামী লাইটার, যার গলার সোনার চেইনে ঝোলানো হৃদয় বাসের দুলুনির সাথে দোল খায়, সে কোনো কথা বলে না। একদম পেছনের সিটে চুপচাপ বসে আছে, একা। হঠাৎ বুঝি খুব রাগ হয় যুবকের। সে চোখ তুলে তাকায়। কার দিকে তাকায় তা বোঝা যায় না। কিন্তু এই চাহনিতেই অনেকের কলিজা শুকিয়ে যায়। এক মুহূর্তের জন্য সরব বাসটা নীরব হয়ে যায়। ঠিক যে তালে যে লয়ে গুঞ্জনটা হৈ চৈ-এ রূপ নিয়েছিলো, ঠিক একই লয়ে হৈ চৈ-টা গুঞ্জন হয়ে একেবারে থেমে যায়। পুরো বাসে এখন একটা অস্বস্তিকর নির্জনতা নেমে এসেছে। খুব ভয় পেলে মানুষ যেমন নিজের সাথে জোরে জোরে কথা বলে, তেমনি এক যুবক কথা বলে উঠলো।

কারেন্ট গ্যালো গা না-কি রে...

তখনি একটু একটু করে বিভিন্ন কর্ণার থেকে মৃদু আওয়াজ উঠতে থাকে। গুঞ্জন উঠতে থাকে। এবং আবারো শুরু হয় মুখর আলোচনা, তীব্র বিতর্ক। মেয়েগুলো রোদে দাঁড়িয়ে থাকবে, ছেলেগুলো রোদে দাঁড়িয়ে থাকবে। বান্ধবীরা, বন্ধুরা, সহপাঠীরা তীব্র রোদে পুড়তে পুড়তে মাছের মতো ছটফট করবে। এ হতে পারে না।

যুবকটি এবার উঠে দাঁড়ায়। গুঞ্জনটা আবারো থেমে যায়। চলন্ত বাসে টলতে টলতে পিছনের সিট থেকে বাসের শিরদাঁড়া মাড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে সামনে চলে আসে সে। আসার সময় এর-ওর গায়ে ধাক্কা লাগে, ঘষা লাগে, ওসবে দৃষ্টিপাত নেই যুবকের। কোনো এক বিশেষ ধ্যানে মগ্ন সে। ওর চোয়ালে একটা কাঠিন্য দানা বাঁধে, চোখে একটা ক্রোধের হুঙ্কার ভর করে। কপালে একটা খাড়া ভাঁজ পড়ে, আলীফ তৈরী হয়। সকলের দৃষ্টি এখন যুবকটির দিকে।

সাবধানে নিঃশ্বাস ফেলছে সবাই, যদি নিঃশ্বাসের শব্দে কিছু ঘটে যায়। ড্রাইভারের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় সে। রিয়ার ভিউ মিররে পুরো দৃশ্যটা দেখে ড্রাইভার কিন্তু ভাব দেখায় ও কিছুই দেখে নি, কিছুই জানে না কি ঘটে যাচ্ছে এই বাসটিতে। এবার ড্রাইভারের কাঁধে হাত রাখে সে। ড্রাইভার কেঁপে ওঠে, স্টিয়ারিং নড়ে যায়। কোনোরকমে গাড়ি সামলায় ড্রাইভার। হার্ড ব্রেক করে। পিচঢালা পথের সাথে চাকার ঘর্ষণে একটা ক্যাৎ করে শব্দ হয়। কয়েকজন পথচারী ভয়ে লাফিয়ে ওঠে, রিক্সার প্যাডেলে রিক্সাচালকদের পা কেঁপে ওঠে। যুবকের কণ্ঠ শীতল, কোনোরকম উত্তেজনার লেশমাত্রও নেই সেখানে।

গাড়ি ঘোরাও মামু, নরমাল রুটে যাও।

পানি মামু, হাঁটু পানি।

তুমি নিজে দেখছো?

হ দেখছি।

কোন সময় দেখছো?

সকালে, আহনের সময়।

আইলা কেমনে?

অনেক কষ্টে, ইঞ্জিল বন্ধ অয় অয় অবস্থা।

অহন পানি কমছে, গাড়ি ঘোরাও।

জ্যাম অইবো মামা। গাড়ি লাড়ান যাইবো না। দুই ঘন্টা লাগবো।

লাগুক।

ড্রাইভার গাড়ি ঘোরায়।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এতে যুবক বিরক্ত হয়। ওর ধারণা ছিলো বাস নরমাল রুটে গেলে সবাই খুশি হবে। এখন দেখছে ধারণাটা ভুল। সবাইকে খুশি করা একটা অসম্ভব ব্যাপার।

রামপুরায় এসে বাস থামে। ছয়জন ছাত্র-ছাত্রী উঠে আসে। চারজন ছাত্রী, দুইজন ছাত্র। ক'জন পুরোনো যাত্রীর মুখে হাসি ফোটে। ওরা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকায় লাল শার্টের দিকে। নতুন যাত্রীরা ড্রাইভারের ওপর ঝাল ঝাড়ে। যে মামুটা হেলপার, পাঁচফুটের কম উচ্চতা, পঞ্চাশ কেজির কম ওজন, একটা কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করে। ওরা একই সঙ্গে সকলে কথা বলে, ফলে কেউ কারো কথা শোনে না। অভিযোগগুলো অভিযোগই থেকে যায়, কৈফিয়তটা কৈফিয়তই থেকে যায়।

অপু তাকায় যুবকটির দিকে। এটাও অরাজগতা, মগের মুল্লুক। কোনো যুক্তি নেই, কোনো জাস্টিফিকেশন নেই। কেউ একজন, অমুক দলের তমুক, চোখ রাঙানী দিলো, অমনি সুড়সুড় করে গাড়ি ঘুরে গেলো। আরেক চোখ রাঙানীতে হয়ত চাকা থেমে যাবে। এটা হতে পারে না। এ অন্যায়। অপুর ইচ্ছে হয় ছেলেটিকে গিয়ে কষে একটা ধমক দিতে। এটা এমন কোনো কঠিন ব্যাপার না। অন্যদলের ক্যাডাররা ওকে মাথায় নিয়ে নাচবে, ও শেল্টার পাবে। ওই দলের কেউ এখন বাসে নেই বলে ওর রক্ষা, নইলে একটা ফাটাফাটি লেগে যেতো। নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ না কেউ নিশ্চয়ই বাসে আছে, ওইদলের সমর্থক। খবরটা ঠিকই পৌঁছে যাবে। হয়ত ততক্ষণে বিষয়টা ঠান্ডা হয়ে যাবে। বাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় অপু। তীব্র রোদে পুড়ছে শহর। তবে আকাশে দূরে দূরে খন্ড খন্ড মেঘের ভেলা ভাসতে দেখা যাচ্ছে। ঝকঝকে শাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশময়। কি স্বাধীন মেঘগুলো। যেখানে খুশি যাচ্ছে। কারো চোখ রাঙানী নেই, ট্রাফিক জ্যাম নেই।

মালিবাগ রেলগেইট পার হয়ে গাড়ি থেমে যায়। বিশাল জ্যাম। সামনে পেছনে শত শত গাড়ি। রিক্সা, টেম্পু, বাস, ভ্যান, মিনিবাস, নানান গতির নানান আকৃতির যানবাহন। সবাই একসাথে হাত-পা তুলে বসে আছে। পুরোপুরি একটা ডেডলক। কৌতুহলী ছাত্রী-ছাত্ররা বাসের সামনের কাচের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মৌচাক মার্কেট পর্যন্ত জলমগ্ন রাস্তা। কত জল কে জানে। নদীর মতো লাগছে। যাত্রীঠাসা থেমে থাকা বাসটির ভেতরের পরিবেশ ক্রমশই গুমট হয়ে উঠছে। গরমে কুলকুল করে ঘামছে সবাই। রাস্তার ওপর জমে থাকা নোংরা পানি থেকে একটা ভ্যাপসা ভাপ উঠছে। বাইরের কাদা-পানি, ঢাকনা খোলা ম্যানহোলের ময়লা আর ভেতরে ঘামের গন্ধ, সব মিলিয়ে একটা অসম্ভব অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। অপু ভাবছে, এই অনাকাঙ্খিত অবস্থার জন্য ওই ছেলেটিই দায়ী, রতন।

ড্রাইভার হাল ছেড়ে দিয়েছে। ওকে দেখে খুবই নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছে, হয়ত এখনি একটা সিগারেট ধরাবে। যেন এ অবস্থার জন্য ওর কোনো দায় নেই এটা সবাই বুঝতে পারাতে ওর রক্ষা হয়েছে। ছেলে-মেয়েরা সবাই একে একে নেমে যাচ্ছে। এখানে-সেখানে শোল মাছের পোনার মতো নাক বের করে এক হাঁটু পানির ওপর বড় রাস্তার দু'পাশের গলিগুলোর মাথার দাঁড়িয়ে আছে ঝাকে ঝাকে রিক্সা। রিক্সা নিয়ে উল্টোদিক দিয়ে পানি ভেঙে পশ্চিম মালিবাগের দিকে

যাচ্ছে সবাই। পশ্চিম মালিবাগের ভেতর দিয়ে মগবাজার অয়ারল্যাস গেইট পর্যন্ত একটা রাস্তা আছে। এই জ্যাম থেকে পরিত্রানের ওটাই একমাত্র উপায়।

বাসের ভেতরে এখন চারজন মাত্র মানুষ। ড্রাইভার এবং হেলপার ছাড়া তৃতীয় মানুষটি অপু। আর চতুর্থজন বাসের পেছনের সিটে নির্বিকার বসে থাকা যুবক, যার নাম রতন। রতন একটা সিগারেট ধরায়। তারপর ফুশ করে খুব জোরে ধোয়া ছাড়ে সামনের দিকে। মাছের লেজ আকৃতির লাইটারটি বাঁ হাতের আঙুলে আঙুলে ঘোরাতে থাকে। হঠাৎ কি মনে হয়, এইমাত্র ধরানো জ্বলন্ত সিগারেটটি বাসের পেছনের দরোজা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বাইরে। ওটা এখন রাস্তার নোংরা পানিতে পড়ে জুপ করে নিভে গেলো। রতন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে এলোমেলো বিক্ষিপ্তভাবে ছুটে চলা রিক্সার চাকার ঘূর্ণনে তৈরী হওয়া নোংরা জলের ঢেউয়ে দুলতে থাকা সিগারেটের টুকরাটির দিকে। এক সময় কাগজের বন্ধন ঢিলা হয়ে গেলে সিগারেটের সূঁখাগুলো বেরিয়ে এসে পানিতে মিশে যেতে থাকে। আর বাদামী রঙের ফিল্টারটি যেন প্রাণপন চেষ্টা চালায় খুলে যাওয়া সিগারেটটিকে ধরে রাখতে।

গাড়ির স্টার্ট বন্ধ না করেই ড্রাইভার ওর সিট থেকে উঠে আসে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে রতনের কাছে। রতন তখন তাকিয়ে আছে অপুর দিকে। ভাবছে, সবাই নেমে গেলো অথচ এই মেয়েটি এখনো নামছে না কেনো? ও-কি এখনো আশা করছে এই জ্যাম ছুটে বাস বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছবে। অপুর দিকে তাকায় না ড্রাইভার, রতনের সামনে এসে দাঁড়ায়।

মামা দুই ঘন্টা লাগবো। বইসা থাকলে লাভ অইবো না। রিক্সা নিয়া জান গা। একটা সিগারেট দেন মামা।

কিছু একটা টের পায় ড্রাইভার। বিষয়টার মোড় ঘুরানোর জন্য সিগারেট চায়। শেষের বাক্যটি বলার সময় যতোটা সম্ভব গলাটাকে নামিয়ে এনে 'মামা' শব্দটার ওপর জোর দেয়। গাড়িটাকে ৪-নম্বর গিয়ার থেকে ১-নম্বরে নামিয়ে এনে আবার এক্সেলেটারে চাপ দিয়ে ধীরে ধীরে ক্লাচ রিলিজ করার মতো।

ড্রাইভারের কথাগুলো রতনের গায়ে ছ্যাকা দেয়। যেন ও মনে করিয়ে দিতে চাইছে 'কইছিলাম না হালার পো দুই ঘন্টা লাগবো, বাস ঘুরান ঠিক হইবো না'।

রতন উঠে দাঁড়ায়। ড্রাইভারের আত্মা কেঁপে ওঠে। হেলপার মামুটাও তখন ভেটকি মাছের মতো হা করে আছে, টাশকি লেগে গেছে। জানালা থেকে চোখ ফেরায় অপু। তাকায় পেছনের সিটের দিকে, যেখানে এখন নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের মঞ্চায়ন হচ্ছে। সমূহ বিপদের গন্ধ টের পেয়ে উল্টা ঘুরে নিজের সিটের দিকে পা বাড়ায় ড্রাইভার। রতন ওর ডান হাতটা ধরে ফেলে। একটানে ওকে ঘুরিয়ে দিয়ে জামার কলার ধরে। ড্রাইভার স্ট্যাচু। একটা সমূহ আঘাতকে গ্রহন করার জন্য ওর সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রস্তুত। চোখ দুটি ছোট হয়ে এসেছে, সেই কুঁতকুঁতে ছোট চোখ, যায় পাতা তিরতির করে কাঁপছে, রতনের বাঁ হাতের পাঞ্জায় স্থির, ধ্যনস্থ । রতন ওর বাঁ হাত বাতাশে বাউলি কেটে পরপর দুইবার সঞ্চালন করে। ড্রাইভারের বাঁ দিকের গালে একটি পাঞ্জা রক্তজবা ফুলের মতো জ্বলজ্বল করছে।

মঞ্চের এ দৃশ্যে আহত হয় অপু। ড্রাইভার তেমন অবাক হয় না। এমন একটা ঘটনা ঘটতে পারে এটা ওর জানাই ছিলো। পাগল ক্ষেপানোর জন্য মনে মনে কিছুটা অনুতপ্ত হয়। বোধ হয় সাঁকো নড়ানোর কথা বলে ভুল করেছে। ড্রাইভিং সিটে গিয়ে ও যখন বসে, তখন ওর মনে হয় কাজটা সে ভুল করে নি। মনের ঝাল মিটাতে পেরেছে। শুয়োরের বাচ্চাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পেরেছে, সে ভুল দিকে গাড়ি ঘোরাতে বাধ্য করেছিলো। রতন ভাবছে, এই থাপ্পর দুটো ওর পাওনা ছিলো। ওর পাওনা ওকে বুঝিয়ে দিতে পারায় সে তৃপ্ত।

হঠাৎ করে নিজের মধ্যে অন্য একজনের নড়াচড়া টের পায় অপু। কে সে? অমিত? ওকে বলছে, এ অন্যায়। এটা মেনে নেওয়া ঠিক না। কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু কি করবে অপু। ও কি রতনকে কষে একটা, না একটা না দুইটা, চড় মারবে। যে দুটো ও ড্রাইভারকে মেরেছে। এতে ওর স্টাডি লাইফের বারোটা বেজে যাবে অথচ ওদের কোনো শিক্ষা হবে না। ওরা এ কাজ এরপরেও করবে। কিন্তু চোখের সামনে এরকম অন্যায় সহ্য করা কি ঠিক হচ্ছে ? যদিও প্রতিদিনই এরকম ঘটনা ঘটছে। একটা দুইটা না, অসংখ্য ঘটনা ঘটছে।

এ সময় বাসটা নড়ে ওঠে, ওর ভাবনাটা ঝড়ে পড়া নৌকার মতো দুলতে থাকে। দুলতে দুলতে স্থির হয়ে যায়। এক হাঁটু পানির ওপর দিয়ে বাসটা চলতে শুরু করে। অসংখ্য গড়ির হর্ণ একসঙ্গে বাজতে থাকে। কে কার আগে যাবে এরকম একটা প্রতিযোগীতা শুরু হয়। গাড়িগুলো লাইন ভাঙতে থাকে। আরো একটি ডেডলকের আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে অপু। রতন ওর সিট থেকে উঠে দাঁড়ায়। বাসের রড না ধরেই ধীরে চলা গাড়িটির ভেতরে ভারসাম্য ঠিক রেখে অপুর দিকে

এগুতে থাকে। অপু ড্রাইভারের দুই সিট পেছনে, জানালায় ঠেস দিয়ে বসা। পেছনের মানুষটিকে দেখে না ও, কিন্তু পায়ের শব্দ পায়। রতন ওর পাশে এসে দাঁড়ায়। অপু জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। আকাশে আবার মেঘ করেছে। উজ্জ্বল রোদটা মেঘের আঁড়ালে ঢাকা পড়েছে। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। হয়ত আবারো বৃষ্টি নামবে। কোনোরকম অনুমতির তোয়াক্কা না করেই ওর পাশে বসে পড়ে রতন। সিগারেটের গন্ধ পায় অপু, ঘামের গন্ধ পায়। দূর্গন্ধে পেটের ভেতরটা গুলিয়ে ওঠে। পুরো বাসটা খালি, অথচ হারামির বাচ্চাটা আমার পাশে এসে বসেছে। কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়ই। বুকের ভেতরটা ধরাস ধরাস করে অপুর। ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে। ও-কি আমার গায়ে হেলান দিলো? অনুভূতিহীন হয়ে পড়ছে ও। দস্যি মেয়েটির হঠাৎ এমন কি হলো যে অমন ভয়ে সেধিয়ে যাচ্ছে। নিজেকে ওর একজন নারী বৈ আর কিছু মনে হচ্ছে না। ওর মধ্যে ক্রমশ নারীত্বের সবগুলো লক্ষণ স্পস্ট হয়ে উঠছে। কোমলতা, লজ্জা, ভীরুতা, স্নিগ্ধতা এইসব। মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে এক দঙ্গল মানুষের ভিড় ঠেলে যে নিজের উপস্থিতি জানান দিতো সবসময়, সেই মানুষটি ক্রমশই মিইয়ে যাচ্ছে। নারীত্ব, নারীর পূর্ণতা কি মানুষকে দূর্বল করে তোলে? অপু তাকায় ওর শরীরের দিকে। গায়ের রঙটা ঈর্ষণীয় রকম উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, ঝিলিক দিচ্ছে। নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে নিজেই লজ্জা পায়। এই যে লজ্জা পাওয়া, এটা কখনোই ছিলো না ওর।

রতন একটা সিগারেট ধরায়। এটা পুরোপুরি অসভ্যতা। ওর ঠোঁট থেকে সিগারেটটা টেনে নিয়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত। কাজটি করতে পারলে শান্তি পেতো অপু। কিন্তু করতে পারছে না। কেনো পারছে না? কে ওকে বাঁধা দিচ্ছে? নিশ্চয়ই এর একটা উত্তর আছে, উত্তরটা খুঁজে পাচ্ছে না অপু। কিসের যেন একটা দ্বিধা কাজ করছে। কি যেন হারানোর ভয় ওর চেতনার মধ্যে কোনো এক অলৌকিক উপায়ে ঢুকে পড়েছে। অতি মূল্যবান কোনো সম্পদ হারানোর ভয়ে যেনো ও ক্রমশই বেশী করে সাবধানী হয়ে উঠছে। যে সম্পদ অর্থ-বিত্তের চেয়েও মূল্যবান, যা হারালে আর কখনো ফেরত পাওয়া যায় না। যে সম্পদ ওর আগে ছিলো না কিন্তু এখন আছে। ওর শুধু মনে হয় ওকে আরো সাবধান হতে হবে, বুঝে-শুনে চলতে হবে। গা ভরা গহনা নিয়ে বাড়ির বৌ-রা যেমন খুব সাবধানে রাস্তায় বের হয় ঠিক তেমনি সাবধান হতে হবে। কোনো এক অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় টের পায় অপু ওর গা ভরা গহনা, কাজেই ওকে অনেক উটকো ঝামেলা এড়িয়ে চলতে হবে। এ গহনা, এ সম্পদ প্রাপ্তি ঈশ্বরের অশির্বাদ না অভিশাপ বুঝতে পারে না অপু।

রতন নির্বিকার। ওর উদ্দেশ্যটা বোঝা যাচ্ছে না। সিগারেটের ধোয়া দিয়ে রিঙ বানানোর জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছে, রিঙ হচ্ছে না। চলন্ত বাসের বাতাশে রিঙ ভেঙে যাচ্ছে। এতে ও মোটেও বিরক্ত হচ্ছে না। ‘একবার না পারিলে দেখো শতবার’ মন্ত্রে দীক্ষিত এক সাধু পুরুষের মতো ক্রমাগত ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে।

গহনা ভরা শরীর আর নিরাভরণ গা, এ দুয়ের দোদূল্যমানতায় দুলতে দুলতে অপু রতনের মুখ থেকে সিগারেটটা কেড়ে নেয়। নিয়েই জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দেয় বাইরে। বাসটা তখন কাকরাইল মোড় থেকে ডানে বাঁক নিয়ে শাহবাগের দিকে ছুটছে। রতন তবুও নির্বিকার। কি এক ধ্যানে যেন মগ্নসাধু। যেন কোনো কিছুই ঘটে নি এইরকম একটা নির্বিকার ভঙ্গিতে প্যাকেট থেকে আরো একটা সিগারেট বের করে। সিগারেটে অগ্নি সংযোগের জন্য মাছের লেজে চাপ দেয় ও।সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে। ঝড়াহত মেঘের মতো ধোঁয়ার কুন্ডলিটা মুহূর্তের মধ্যে বাতাশে মিলিয়ে যায়। বিশ্রি গন্ধটা তবু এসে অপুর নাকে লাগে।

পরদিন সকাল। মধুর কেন্টিনের পেছনে অন্যদলের দু’জন ছেলে রতনের দু’হাত দু’দিকে টেনে ধরে আছে। তৃতীয় ছেলেটি একটি কেচি দিয়ে ঘচ ঘচ করে ওর অনেক সাধের লম্বা চুলগুলি এলোপাথারি কেটে প্রায় ন্যাড়া করে দিচ্ছে। চুল কাটা শেষ হয়ে গেলে ছেলেগুলি ওর বুকে মুখে এলোপাথারি কিল-ঘুষি মারতে মারতে খিস্তি করছে:

মাদার চোদ, বাসের মইধ্যে রংবাজি চোদাও
মার শালারে
ফাটায়া দে
ড্রাইভারের গায়ে হাত তোলোন চোদাও
গোয়ার মইধ্যে মার
পুটকি ফাটায়া দে
চোখ খুইলা ফালামু
ওই খানকির পোলা, রাজাকার, ডাক তোর গডফাদারগো।

মার শালারে, মার।

খিস্তি করতে করতে উন্মাদ হয়ে ওঠে ছেলেগুলো। তখন মারধরের বিষয়টা আর শুধু হাত ও পায়ের মধ্যেই সীমিত থাকে না। হাতের কেচিটিও হয়ে ওঠে হাতিয়ার। রতনের গালে কেচি বসে যায়, বুকে ঢুকে যায় কেচির ছুঁচালো ডগা, আর ফিনকি দিয়ে যখন ওর বুক থেকে রক্ত বের হয়ে আসে তখন ওর গায়ে অসুরের শক্তি ভর করে। ধস্তা-ধস্তির এক পর্যায়ে তিনজনের হাত থেকে একটু পিছলাতে পেরেই ও ছুটতে শুরু করে। ছুটতে ছুটতে সোজা জসীম উদদীন হল।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই একটা হুলুস্থুল, ধুন্ধুমার কান্ড বেঁধে যায় ক্যাম্পাসে। দুই দলের ক্যাডারদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং এক পর্যায়ে শুরু হয় অস্ত্র ও গোলাবারুদের শো-ডাউন। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে এদিক-সেদিক ছুটতে থাকে। অপু তখন টিএসসিতে, ক্লাসের একঘন্টা বাকী, বন্ধুদের সাথে মধুর আড্ডায় মগ্ন। গোলাগুলি এবং হৈ চৈ-এর শব্দে মগ্নতা ভাঙে ছয়জনের এই ছোট দলটির। টিএসসির বারান্দা থেকে উঠে ওরা বাইরে বেরিয়ে আসে। শত শত ছাত্র-ছাত্রী, পথচারী, হকার সবাই দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। ছয়জনের দলটি আর দল থাকে না। প্রত্যেকে 'আপন প্রাণ বাঁচা' হয়ে যায়। প্রথমে সবাই একদিকে ছুটতে শুরু করলেও একসময় ওরা নিজেদেরকে আবিস্কার করে এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো আলাদা। শুরু হয় এলোপাথারি গাড়ি ভাঙার খেলা। এ খেলায় একটি লেটেস্ট মডেলের এক্সিভ চুরমার হয়ে যায়। গাড়ির কাচগুলো ডিমের খোসার মতো ভেঙে গিয়েও কিছুক্ষণ ঝুলে থাকে, তারপর উপুর্যপরি হকিস্টিক আর রডের আঘাতে দূর্বল হয়ে ঝরে পড়ে। একটি বিআরটিসি বাস কোত্থেকে ছুটে এসে সাক্ষাত আজরাইলের সামনে পড়ে। একদল রড হাতে উত্তেজিত ছাত্র-ক্যাডার বাসটির গায়ে ওদের শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঝাল ঝাড়তে থাকে। হতভম্ব যাত্রীরা ইয়ানাফসি ইয়ানাফসি করতে করতে বাস থেকে নেমে 'পড়ি কি মরি' করে ছুটতে থাকে, যে যার বিবেক-বুদ্ধি মতো নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে। একজন বয়স্ক যাত্রী, যার শুভ্র দাড়িগুলো নাভির কাছাকাছি নেমে এসেছে, 'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা' পড়তে পড়তে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দিকে ছুটতে থাকে। বুড়ো মানুষটির চোখের সামনে ভেসে ওঠে ১৯৭১। ৭১ থেকে ৯৪, দেশ স্বাধীন হবার ৩৩ বছর পরেও এই ঘটনা কেন ঘটে এই সহজ সরল বাঙালী মুসলমান তা বুঝতে পারে না। দু'মিনিটের মধ্যেই বাসটিতে আগুন ধরে যায়। আগুন ধরে যায় দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠের ক'জন ছাত্রের রক্তের মধ্যেও। ক্রমশ আগুন আগুন খেলায় মেতে ওঠে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। এরি মধ্যে কয়েকজন যুবক কোত্থেকে কিছু গাড়ির টায়ার জোগাড় করে এনে তাতে অগ্নি সংযোগ করে বহ্নি উৎসবের আয়োজন করে। জ্বলছে এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এরপরই শুরু হয় কাটা রাইফেল আর দেশী পিস্তলের গুলি বর্ষণের খেলা। সাথে উত্তেজিত যুবকদের খিস্তি:

ধর শালারে
পিটা শালারে
মার শালারে
পলাবি কই, ওই হারামীর বাচ্চা
ওই যে, ওই যে, ধর, শুয়োরের বাচ্চারে ধর
রাজাকারটারে ধর, ওই যে, ওই যে
মালাউনটারে ধর, ওইটারে ধর

একদল ছত্রভঙ্গ ছাত্র-ছাত্রী একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করে, স্লোগানে আওয়াজ তোলে:

জ্বা.....লো..... জ্বা.....লো.....
আ...গু.....ন জ্বা.....লো.....
খালেদা জিয়ার গদিতে
আগুন জ্বালো একসাথে

আরেকদল অন্যদিকে, অপরাজেয় বাংলার কাছে, পাল্টা স্লোগান দেয়:

ভারতের দালালরা
হুশিয়ার সাবধান
'র'-এর এজেন্টরা

হুশিয়ার সাবধান

ধীরে ধীরে নানান দিক থেকে ছোট ছোট মিছিল আসতে থাকে টিএসসির দিকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যায় এতোসব ঘটনা। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত ক্যাম্পাস, থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে পুরো এলাকা জুড়ে। হঠাৎ কবি নজরুলের কবরের পূর্বপাশে রাস্তার মাঝখানে একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরিত হয়। অপু তখন দৌড়াতে দৌড়াতে প্রায় চারুকলার কাছে পৌঁছে গেছে। ওর সামনে-পেছনে আরো অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী ছুটছে। বোমার ছোট ছোট স্প্লিন্টার উড়ে এসে ওর কপালে, গালে, পিঠে আঘাত করে। অপু তবু দৌড়াচ্ছে। কোথায় কি লেগেছে, কোথায় কেটেছে, কোথায় জ্বলে যাচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে, ওর গায়ে কি কেউ ঢিল ছুঁড়লো নাকি গুলি লাগলো ও কিছুই বুঝতে পারে না। কেবল এটুকু বুঝতে পারে ওকে অন্তত শাহবাগ পর্যন্ত দৌড়াতে হবে, বিরতিহীন। থামা যাবে না। থামলেই বিপদ।

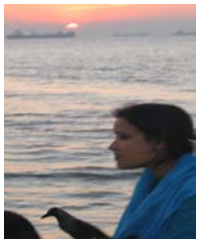

ইজি চেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় চোখ মুদে আছেন অবসরপ্রাপ্ত ডিআইজি এ কিউ খন্দকার। বাঁ দিকের একটি ডাবল সোফায়, বলগা হরিণের চামড়ার ওপর, হেলান দিয়ে বসা কনিকাড়া হামিদা খন্দকার হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আলী আহমদ। খন্দকার সাহেবের কপালের চিকন ঘামের রেখা তিনটি অর্ধচন্দ্রকে সুস্পস্ট করে তুলেছে। গভীর দুশ্চিন্তার আভাস। হেডমাস্টার সাহেব কিছু বলবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন কিন্তু ভয়ে বলতে পারছেন না। তিনি দেয়ালে সাঁটানো একটি বারো ফুট দীর্ঘ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের চামড়ার দিকে তাকিয়ে আছেন। ভাবছেন এইরকম একটা চামড়া তার স্কুলে থাকলে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের খুব সহজেই জাতীয় পশু চেনাতে পারতেন।

সামনের তের তারিখে তিতাসে নৌকা ভাইস প্রতিযোগীতা। প্রতি বছরের মতো এবারও নবীনগর থানার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে, গ্রাম থেকে, প্রতিযোগীরা নানান রঙে সাজানো কতো কতো বাহারী রঙিলা ডিঙ্গি, সরোঙ্গা নিয়ে আসবে। কনিকাড়া হামিদা খন্দকার হাই স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্ররা মিলে একটা টিম গঠন করেছে। নৌকা তৈরীর কাজও বেশ জোরে-সোরে এগিয়ে চলেছে, দেড়শ ফুট লম্বা সরোঙ্গা নৌকা। ছিয়াত্তুরটা গুঢ়া থাকবে সরোঙ্গায়। আটটি দাঁড় আর চল্লিশটি বৈঠা যখন তিতাসের পানি কাটতে শুরু করবে, কনিকাড়া হামিদা খন্দকার হাই স্কুলের সাড়ে পাঁচ ফুট প্রশস্ত দাড়াশ সাপের মতো সরোঙ্গাটি তখন বাতাশে শিষ কেটে হাওয়ায় উড়াল দিবে। আলী আহমদ সাহেব চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পান তিতাসের বুকে ভাসছে হামিদা খন্দকার হাই স্কুলের নাম লেখা লাল ব্যানারে শোভিত দেড়শ ফুট দীর্ঘ একটি সরোঙ্গা। আর তার অতি প্রিয় ছাত্ররা সেটিকে পঙ্খীরাজের মতো চালিয়ে চোখের নিমিষে সকলের আগে পৌছে গেছে গন্তব্যে। এবারের ভাইসের প্রথম পুরস্কার একটি ২১ ইঞ্চি রঙিন টেলিভিশন। আধুনিক স্কুলে একটি রঙিন টেলিভিশন থাকা খুবই জরুরী। ছেলে-মেয়েরা, শিক্ষকরা সংবাদ শুনবে, নিজের চোখে দেখবে দুনিয়ার কোথায় কি ঘটছে। টিমের খরচপাতির জন্য টাকা দরকার। নৌকা তৈরীর সব টাকাও এখনো জোগাড় হয় নাই। টাকার জোগাড়েই আলী আহমদ সাহেব ঢাকা এসেছেন। খন্দকার সাহেবের স্ত্রীর নামে স্কুল। সেই স্কুলের টিম। টাকার জন্য তার কাছে না এসে তিনি আর কোথায় যাবেন?

হেডমাস্টার সাহেব?

চোখ বন্ধ করে খুব মৃদুস্বরে ডাকেন খন্দকার সাহেব। কালো মোটা ফ্রেমের চশমাটা ডানদিকের কান থেকে খসে গেছে, নাকের ওপর তেছড়াভাবে বসে আছে।

জ্বি স্যার।

টেবিলের ওপর কয়টা খবরের কাগজ আছে?

ছয়টা স্যার। চারটা বাংলা, দুইটা ইংরেজী।

শিরোনামগুলি পড়েন।

হেডমাস্টার সাহেব অনুগত ছাত্রের মতো পড়তে শুরু করেন।

‘দুই গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধ/বিশ্ববিদ্যালয় রণক্ষেত্র’

-দৈনিক ইত্তেফাক

‘বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমা বিস্ফোরণ/সাতজন আহত’

-দৈনিক জনকণ্ঠ

‘প্রেমের আগুনে জ্বলছে বিশ্ববিদ্যালয়

কে এই ট্রয় নগরীর হেলেন?’

-দৈনিক আজকের কাগজ

‘ঢাবিতে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ

ঘটনার নায়িকাসহ আহত সাত’

-দৈনিক ইনকিলাব

স্যার, ইংরেজীগুলোও পড়বো?

না, থাক।

চোখ মেলে তাকান খন্দকার সাহেব।

হেডমাস্টার সাহেব।

জ্বি স্যার।

ইনকিলাবের নিউজটা পড়েছেন?

জ্বি স্যার, দুইবার পড়েছি।

আপনার কি মনে হয় আমার মেয়ে রাজনীতির সাথে জড়িত আছে?

জ্বি না স্যার। অপু মামণি রাজনীতির সাথে জড়িত নাই।

খন্দকার সাহেব সোজা হয়ে বসেন। চশমাটা ঠিকমতো চোখে দিয়ে ইজি চেয়ার থেকে উঠে হেডমাস্টারের মুখোমুখি একটি সিঙ্গেল সোফায় বসেন।

কি করে বুঝলেন যে আমার মেয়ে রাজনীতির সাথে জড়িত না?

স্যার, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রশ্নকর্তা নিজেই সবচেয়ে সঠিক উত্তরটা জানেন। অন্যকে প্রশ্ন করেন আত্মবিশ্বাস পরীক্ষা করার জন্য। আপনার প্রশ্ন করার ধরন দেখে আমি উত্তরটা আন্দাজ করেছি। প্রশ্নকর্তা সবসময় তার প্রশ্নের একটি নির্দিষ্ট উত্তর প্রত্যাশা করেন। বুদ্ধিমান উত্তরদাতা ঠিক সেই উত্তরটাই দেয়। যে ছাত্র এগজামিনারের মনের মতো উত্তর লেখতে পারে, সেই ছাত্রই পরীক্ষায় অধিক নম্বর পায়। আমি আমার ছাত্রদের এই কথা সবসময় বলি স্যার।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন খন্দকার সাহেব।

আপনি খুব ভালো হেডমাস্টার আলী আহমদ সাহেব।

আলী আহমদ সাহেব সোফা থেকে উঠে দাঁড়ান। এগিয়ে গিয়ে খন্দকার সাহেবকে কদমবুসি করেন। খন্দকার সাহেব এতে প্রীত কিংবা বিরক্ত কোনোটাই হন না। আবেগে আলী আহমদ সাহেবের চোখে পানি এসে যায়। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান তাকে 'খুব ভালো' হেডমাস্টার বলেছেন, এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কি হতে পারে। তিনি তার কাঁধের ওপরে ভাঁজ করে রাখা শালটা দিয়ে চোখ মোছেন।

স্যার, আপনার মুখের এই একটি বাক্য আমার জন্য যে কত বড় প্রাপ্তি আমি বলে বোঝাতে পারবো না।

সিরাজ।

খন্দকার সাহেবের ডাকে মধ্যবয়স্ক কাজের লোক সিরাজ এগিয়ে আসে।

মস্টার সাহেব কে গেস্ট রুম দেখিয়ে দাও। যান হেডমাস্টার সাহেব। হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম করেন। আমি ওপরে যাচ্ছি।

ড্রয়িংরুমের ভেতর থেকে একটি পেঁচানো সিঁড়ি পাক খেয়ে উঠে গেছে দোতলায়। ওখানেই খন্দকার সাহেবের বেডরুম। দোতলাতেই, অন্য পাশে আরো দুটি বেডরুম। একটি মিলির, অন্যটি অপুর। হামিদা খন্দকারের সাড়া জীবনের স্বপ্ন ছিল একটি ডুপ্লেক্স বাড়ি করার। মানুষের জীবনের সেরা স্বপ্নটিই হয়ত পূরণ হয় না। হামিদা খন্দকারেরও হয় নি। তিনি এই ডুপ্লেক্স বাড়িটি দেখে যেতে পারেন নি। হামিদা খন্দকার যখন মারা যান, তখন খন্দকার সাহেব কোনোরকমে একতলাটা দাঁড় করিয়েছিলেন। দেয়ালে চুনকামও করাতে পারেন নাই। বাড়ির নাম রেখেছিলেন খন্দকার ভিলা। স্ত্রীর মৃত্যুর অনেক বছর পর যখন তিনি রিটায়ারমেন্টের টাকা দিয়ে ডুপ্লেক্সটা সম্পন্ন করেন তখন বাড়ির নাম বদলে রাখেন হামিদা লজ।

হামিদা লজের কলিং বেল বেজে ওঠে। খন্দকার সাহেব সিঁড়ির মাঝ বরাবর উঠে বেলের শব্দে থেমে দাঁড়ান। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকান ড্রয়িংরুমের সদর দরোজার দিকে। সিরাজ ততোক্ষণে দরোজা খুলে দিয়েছে।

তিনজন মানুষ ঘরে ঢোকে। দলপতি খন্দকার সাহেবের দিকে তাকিয়েই একটি সেল্যুট ঠুকে দেয়।

স্যার আমি ডিবির ইন্সপেক্টর হাবিব। আমরা স্যার মিস শিরিন খন্দকার অপুর সাথে দুই মিনিট কথা বলবো।

আপনারা বসেন।

খন্দকার সাহেব অসমাপ্ত সিঁড়ির ধাপগুলো ভেঙে দোতলায় উঠে যান।

হেডমাস্টার সাহেব একটা আউলাঅরুন্ডির মধ্যে পড়ে গেলেন। তিনজন পুলিশ বাড়িতে। এই রকম একটা দূর্ঘটনা ঘটে গেল গতকাল। এর মধ্যে টাকার কথা তিনি কি করে তোলেন বুঝে উঠতে পারছেন না। বেশী দেরীও করা যাবে না। আজ বিকেলের ট্রেনে ভৈরব হয়ে নবীনগরের লঞ্চ ধরবেন ঠিক করে রেখেছেন। কিন্তু ভাবগতি দেখেতো মনে হচ্ছে না তিনি আজ যেতে পারবেন। অথচ তিনি নবীনগর পৌঁছাতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই নৌকা ভাইসে

অংশ নেওয়াটা ইজ্জতের মামলা। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেবকে তিনি নিজে কথা দিয়েছেন, নৌকা তৈরীর কাজও এগিয়ে চলেছে। এখন রণে ভঙ্গ দেওয়া কিছুতেই সম্ভব না। কিন্তু খন্দকার সাহেবের মনের যে অবস্থা যদি তিনি টাকা না দেন তাহলে কি হবে? মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে হেডমাস্টার সাহেবের। আগামীকল্য প্রতিযোগীতার ফিস জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। যে করেই হোক কাল সূর্যাস্তের পূবেই আমাকে নবীনগর পৌছাতে হবে। স্কুলের সকল শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র-ছাত্রী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। না, না, যে করেই হোক কথাটা খন্দকার সাহেবকে মুখ ফুটে বলে ফেলতেই হবে। একবার মুখ ফুটে বলে ফেলতে পারলে খন্দকার সাহেবের টাকা বের করতে সময় লাগবে না। তিনি ওয়ান-টুতে টাকা দিয়ে দেবেন।

আলী আহমদ সাহেব আর গেস্টরুমের দিকে না গিয়ে ইনকিলাবের নিউজটা আরো একবার পড়তে শুরু করেন। যে লোকটি ইন্সপেক্টর হাবিব, টেরা চোখে দুবার তাকালো হেডমাস্টারের দিকে। হেডমাস্টার এতে খানিকটা কেঁপে ওঠেন। বলাতো যায় না, পুলিশ বলে কথা। বাঘে ছুঁলে এক ঘা পুলিশে ছুঁলে সতের ঘা। এই প্রাণী থেকে যতোটা দূরে থাকা যায় ততোই নিরাপদ। তিনি খবরের কাগজটা দিয়ে নিজের মুখটা এমনভাবে ঢেকে রাখেন যাতে ভুল করেও হাবিবের সাথে চোখাচোখি না হয়। এবার তিনি নিউজটা পড়তে শুরু করেন।

‘দুই দলের বন্দুকযুদ্ধ, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। কবি নজরুলের কবর সংলগ্ন রাস্তায় এক শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে ঘটনার নায়িকা শিরিন খন্দকার অপুসহ সাতজন আহত হয়। আগের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড্ডা-রামপুরা রুটের বাস ফাল্গুনীতে ছাত্রদলের ক্যাডার আব্দুল কাদের রতনের সাথে ছাত্রলীগের শিরিন খন্দকার অপুর বাকবিতন্ডাকে কেন্দ্র করে এই নাশকতামূলক ঘটনার অবতারণা। বিশ্ববিদ্যলয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। স্বরাস্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য ভিসিকে চেয়ারম্যান করে তিন সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা (১১শ পৃ. ৭-এর ক. দ্র.)।’

আপনি কে?

ইন্সপেক্টর হাবিবের প্রশ্নে হেডমাস্টার সাহেবের তন্ময়তা কেটে যায়।

জ্বী, আমাকে বললেন?

এই দুইজনতো আমারই লোক। এই ঘরেতো আপনি ছাড়া আর কোনো অচেনা প্রাণী দেখতাছি না।

আমি কনিকাড়া হামিদা খন্দকার হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আলী আহমদ।

স্যারের স্ত্রীর নামে বুঝি স্কুল?

জ্বী-অ।

হঠাৎ আলী আহমদ সাহেবের মনে হয়, কাজটা কি ভুল করলাম? এই লোক আবার স্কুল নিয়া কোনো ঝামেলা করবে না-তো? স্যারের স্ত্রীর নামে স্কুল, স্কুল করার টাকা পেলো কোথায়, এইসব?

ভেতরটা কেমন খচখচ করে আলী আহমদ সাহেবের।

হেডমাস্টার সাহেবের কি জ্বর?

আলগা কথায় মেজাজ খারাপ হয় হেডমাস্টারের। কিন্তু মেজাজ খারাপ করলে চলবে না। এখন সময় খারাপ। খারাপ সময়ে মেজাজ ভালো রাখতে হয়। মেজাজ খারাপ করতে হয় ভালো সময়ে। এই জন্য বড়লোকদের মেজাজ সব সময় খারাপ থাকে।

জ্বী-না। আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে আমার শরীর সুস্থ আছে।

তাইলে যে এই গরমের মইধ্যে একটা কাশ্মিরী শাল গায়ে দিয়া রাখছেন?

এইটা হইলো গিয়া জনাব অলঙ্কার। আমার ছোট ভায়েরা দুবাই থেকে এনেছে। স্ত্রীলোকের অলঙ্কার হইলো গিয়া সোনা-দানা আর পুরুষের অলঙ্কার হইলো গিয়া শাল, টুপি এইসব। আমিতো শালটা গায়ে দেই নাই। দেখতাছেন না, ভাঁজ করে কাঁধের ওপরে রেখেছি। শীতকাল আসলে গায়ে দেবো ইনশাল্লাহ। আপনারা মামণির সাথে দেখা করেন, আমি গেস্টরুমে যাই। অনেক দূর থেকে এসেছি। বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

হেডমাস্টার সাহেব গেস্টরুমের দিকে পা বাড়ান। তখনি টেলিফোন বেজে ওঠে। এই ঘরে ফোন ধরার মতো কেউ নেই দেখে আলী আহমদ সাহেব টেলিফোন সেটটার দিকে দুপা এগিয়ে কারো আগমন প্রত্যাশা করছেন, এইরকম দৃষ্টিতে দোতলার সিঁড়ির দিকে তাকান। টেলিফোনের শব্দে ওপর থেকে মিলি ছুটে আসে। ইন্সপেক্টর হাবিব আর তার সঙ্গীদের দেখে মিলির পায়ে খানিকটা জড়তা ভর করে। ফোন তোলে মিলি।

হ্যালো।

স্লামালেকুম। আমি সাপ্তাহিক পূর্ণিমা থেকে বলছি। আমি কি শিরিন খন্দকারের সাথে একটু কথা বলতে পারি?

হোয়াট? আপনারাতো ভালো করেই জানেন ও আহত। এ অবস্থায় কি করে কথা বলবে? তাছাড়া ও কোনো কাগজের লোকের সাথে কথা বলবে না। আপনি দয়া করে পরেও আর ফোন করবেন না।

হ্যালো....হ্যালো.....শুনুন...আপনি, আপনি কে বলছেন? হ্যালো..হ্যালো..

ফোন রেখে দেয় মিলি।

আবারো ফোন বাজে

হ্যালো

আমি ভোরের কাগজ থেকে বলছি, আমি কি....

লাইন কেটে দেয় মিলি

আবার ফোন বেজে ওঠে।

আমি জনকণ্ঠ থেকে বলছি.....

আমি ইত্তেফাক থেকে বলছি.....

আমি সংগ্রাম থেকে বলছি.....

আমি সংবাদ থেকে বলছি.....

ওহ্ অসহ্য।

খন্দকার সাহেব দোতলার রেলিঙে হেলান দিয়ে তাকিয়ে আছেন মিলির দিকে। এবার তিনি ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসেন।

আবারো টেলিফোন বেজে ওঠে।

রিসিভার তোলেন খন্দকার সাহেব। মিলি ভয় পায়। তিনি না আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তাহলেতো.....

আব্বু তুমি যাওতো, আমি কথা বলছি।

দেখি না কে।

হ্যালো।

স্লামালেকুম। আমি শুধু জানতে চাচ্ছিলাম অপু এখন কেমন আছে?

হু দ্যা হেল ইউ আর। শী ইজ জাস্ট ফাইন, গেট লস্ট।

খন্দকার সাহেব ফোন রেখে দেন

মিলির উৎকণ্ঠা আরো বেড়ে যায়। খন্দকার সাহেব রাগে কাঁপছেন। ঠিক গতবছরের মতো অবস্থা।

আব্বু, আব্বু..প্লিজ। আমি সব দেখছি। তুমি চলোতো, ঘরে চলো।

মিলি খন্দকার সাহেবকে ধরে, ওপরে, তার নিজের ঘরে নিয়ে যায়।

অমিতকে খুব অস্থির দেখাচ্ছে। আজ শুক্রবার, অফিস বন্ধ।

ও-কি আবার ফোন করবে? সিদ্ধান্ত নিতে পারে না অমিত। রিজভি এবং ডলি দুজনই প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর চোখের দিকে।

দোস্ত, মনে হয় প্রচুর আজে-বাজে ফোন আসছে।

কে ফোন ধরেছিল?

রিজভি প্রশ্ন করে।

মনে হয় ওর বাবা। ভীষণ ক্ষ্যাপা। মনে হলো ফোন রিসিভ করতে করতে বিরক্ত হয়ে গেছেন। আমি কি আবার ফোন করবো? না-কি ওদের বাসায় চলে যাবো?

আমার মনে হয় এখনি আবার ফোন করা ঠিক হবে না। আর ও বাসায় তুই যাবি কি হিসাবে? যদি অপু তোকে চিনতেই না পারে?

না, এটা হতে পারে না। ও আমাকে অবশ্যই চিনতে পারবে।

রিজভিকে পেছনে ফেলে ডলি এগিয়ে আসে।

আপনি অতো অস্থির হবেন না অমিত ভাই। হয়ত আঘাত তেমন সিরিয়াস কিছু না। একটা কাজ করা যায়। বাড্ডারই একটি মেয়ে আহত হয়েছে। আমিওতো মেয়ে, একই এলাকার। বিকেলে না হয় আমি একবার ওদের বাড়িতে যাই, দেখে আসি অবস্থাটা কি?

একটি চড়ুই পাখি রিজভিদের টিনশেডের ভেন্টিলেটর থেকে উড়ে যাবার সময় একগাদা খড় ফেলে ফ্লোরটা নোংরা করে দিলো।

রিজভি খুব ক্ষেপে যায়।

কি বললে তুমি? তুমি ও বাড়িতে যাবে মানে? ইউ আর এ পপুলার আর্টিস্ট। ইউ কান্ট মুভ লাইক দিস। তোমাকে কে না চেনে? শেষে কাগজে খবর বেরুবে ডলি সায়ন্তনী আওয়ামী লীগ করে। তাছাড়া..

অমিতের কাঁধে হাত রেখে বলে রিজভি,

তোদের পাড়ার ব্যাপার-স্যাপার আলাদা। আমি যতদূর জানি ডিআইজি সাহেব এলাকার কারো সাথে তেমন একটা মেশে-টেশে না, তার মেয়েরাও না। এলাকাবাসী হিসাবে অসুস্থ কাউকে দেখতে ও বাড়িতে যাওয়াটা কারো জন্যই খুব একটা সুখকর কিছু হবে না।

দোস্ত আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও কোনো রাজনীতির সাথে জড়িত না।

কিন্তু কাগজেতো কথাটা বেরিয়েছে।

এদেশের সাংবাদিকরা তিলকে তাল করে, একথা কে না জানে?

এক্সাক্টলি। ঠিক এ কারণেই আমি ডলিকে যেতে নিষেধ করছি।

তোর কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু আমার খুব অস্থির লাগছে।

তুমি শালা গেছো। লেট্স ট্রাই টু ফাইন্ড এ সলিউশন।

টেলিফোন বেজে ওঠে। ফোন ধরতে পাশের ঘরে যায় রিজভি।

হ্যালো। কে? সিলেট থেকে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি রিজভি, ডলির হাজব্যান্ড বলছি। হ্যাঁ, আপনি আমাকে বলতে পারেন। কবে? বাইশ তারিখ? দাঁড়ান দেখছি।

ডায়রীর পাতা উল্টানোর শব্দ পায় অমিত।

একটা টেনটেটিভ বুকিং আছে, এখনো অ্যাডভান্স করে নি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পারা যাবে। আরে ভাই বললামতো অসুবিধা হবে না। হ্যাঁ, আপনি কাল এসে অ্যাডভান্স করে যান। ওর রেট জানেন তো? কি বললেন? নারে ভাই। ওই টাকায় ডলি সায়ন্তনী ঢাকার বাইরে প্রোগ্রাম করে না। অবশ্যই ডিফরেন্স আছে। এখানে এট লিস্ট তিনদিনের ইনভলভমেন্ট। আপনি বরং অন্য শিল্পী দেখেন। রাগ করবো না! আপনিতো রাগ করার মতো কথাই বলছেন। কত? এটা কি মাছের বাজার পেয়েছেন যে দামাদামী করছেন? শুনুন, আমি আপনাকে ক্লিয়ার কাট কথা বলছি। ডলিকে দেবেন ২৫ হাজার টাকা। ওর সাথে পাঁচজন হ্যান্ডস যাবে। প্রত্যেককে দেবেন ২ হাজার করে মোট দশ হাজার। ডলির সাথে আমি যাবো। আমাদের দুজনের জন্য প্লেনের টিকেট আর অন্যদের দেবেন এয়ার কন্ডিশন্ড বাসের টিকেট। আমাদের থাকার ব্যাবস্থা করবেন কোনো ফোর স্টার হোটেলে। এখন ভেবে দেখেন। যদি রাজী থাকেন তাহলে এক ঘন্টা পর ফোন করে কনফার্ম করবেন আর কাল বিকেলের মধ্যে এসে অ্যাডভান্স করে যাবেন। ওকে? কে? কার কথা বললেন?

গলাটা এবার নামিয়ে আনে রিজভি।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। উনার পরিচয় যখন দিলেন তখন আপনাদের ফাংশন আমরা করে দেবো। আর শুনুন, ডলির এমাউন্ট থেকে পাঁচ হাজার টাকা কমিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, এখন খুশিতো? তো কাল দেখা হচ্ছে। আর শুনুন, কাল সন্ধ্যার মধ্যে অ্যাডভান্স না করলে কিন্তু আমরা অন্য পার্টির কাছ থেকে অ্যাডভান্স নিয়ে নেবো। তখন আবার আমাদের দোষ দিতে পারবেন না। ঠিক আছে, এখন তাহলে রাখি ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম।

রিজভি ফোন রেখে দেয়।

ডলির কপালে একটা বিরক্তির ভাঁজ পড়ে। হয়ত পার্টির সঙ্গে রিজভির এই দর কষাকষি ব্যাপারটা ওর পছন্দ হয় নি। পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে রিজভি। ওকে বেশ খুশি খুশি লাগছে। স্ত্রীর লেজ ধরে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে খারাপ লাগছে না। সেই সাথে বানের জলের মতো টাকাও আসছে। টিনশেড ভেঙ্গে খুব শিগগীরই নতুন কন্স্ট্রাকশনে হাত দেওয়া যাবে। সোনার ডিমপাড়া হাসের পাশে এসে গাঁ ঘেষে দাঁড়ায় রিজভি। অমিতের সামনেই ওরা দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে আদর করে।

ইন্সপেক্টর হাবিব কাউকে এলাউ করছে না। থাই গ্লাসের পার্টিশনটা টেনে দেওয়া হয়েছে। কাচের অন্যপাশে মিলি দাঁড়িয়ে। মিলি জানে ওর ছায়াটার দিকে তাকিয়ে থেকে অপু অনেক সাহস পাবে। নিচে, ড্রয়িংরুমে, মনির অন্য পুলিশ দুজন আর অপুর বন্ধুদের সঙ্গ দিচ্ছে। খন্দকার সাহেবের কড়া নির্দেশ, তার অনুমতি ছাড়া বাইরের কেউ অপুর ঘরে ঢুকবে না।

হাবিব খুব ঠান্ডা মাথায় একের পর এক প্রশ্ন করছে। ওর প্রশ্নের ধরণ দেখে অপুর বিরক্তি যখন ব্রহ্মতালু স্পর্শ করে তখন ও কাচের ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছায়াটির দিকে তাকায়। এতে ও সাহস পায়। ধৈর্য ধরার শক্তি পায়। আর মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে একজনের সজীব চোখ দুটোকে মনে করার চেষ্টা করে। অপু এখনো খবরের কাগজগুলো দেখে নি। তবে মিলি ওকে মোটামুটি একটা সিনপসিস দিয়েছে। আর বলেছে, আগে সুস্থ হয়ে ওঠ তারপর এসব নিয়ে ভাবা যাবে। কিন্তু এই বিষয়ক চিন্তা-ভাবনাগুলোকে ওরা না হয় ড্রয়ারে বন্দী করে তালা মেরে রাখলো। অন্যরাতো ছাড়ছে না। এই যে পুলিশের লোক এসে জেরা করছে, সাংবাদিকরা একের পর এক ফোন করছে। সমস্যাকে পাশ কাটাতে চেয়ে কোনো লাভ নেই, বরং তা ফেইস করাই ভালো। মিলি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। বাবার সূত্রে যেখানে যতো কানেকশন আছে, সব কাজে লাগাতে হবে। দরকার হলে মনিরকে নিয়ে মিলি আইজি চাচার বাসায় যাবে। বাবাওকি এই বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন না? মিলি দেখতে পাচ্ছে, অপু জোরে জোরে হাত নাড়ছে। তার মানে ও ক্ষেপে গেছে, রেগে গেছে। মিলি জানে, এটাই ওর রাগ প্রকাশের ভাষা। রেগে গেলে জোরে জোরে হাত নেড়ে কথা বলবে। নিচের লেভেলের পুলিশগুলোর কোনো ভদ্রতাজ্ঞান নেই, পিচাশের চেয়েও অধম। নিশ্চয়ই ইন্সপেক্টর হাবিব খুব অশোভন কোনো প্রশ্ন করেছে।

মিস শিরিন, আপনে ছাত্রলীগের মিছিলে অংশ নিছেন, বলেন নেন নাই?

আমিতো আপনাকে বললাম, ফার্স্ট ইয়ার-সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময় নিজেদের এগজিস্টেন্সের জন্য এক-আধটা মিছিল-টিছিলে যেতেই হয়।

ইচ্ছা কৈরা যান নাই বলতাছেন?

ইচ্ছার বিরুদ্ধে না, প্রয়োজনে।

কি প্রয়োজন?

সেটাও আপনাকে বলতে হবে?

শুধু সেইটা না, আরো অনেক কিছুই আপনাকে বলতে হবে। কিছু মনে করবেন না। আপনে এমুন একটা খাচ্চৈরা পার্টি করেন....

আমি কোনো পার্টি করি না। আর আপনি এসব আজে-বাজে কথা বলছেন কেন? আশা করি আপনি জানেন আমি কার মেয়ে?

জ্বি, খুব ভালো কৈরাই জানি। স্যারের সাথে নিচে দেখা হৈছে। আপনার বাবার সাথে আমার কাজ করার সুযোগ হয় নাই, তবে এইটা জানি যে তিনি একসময় ডিবির এসপিও ছিলেন। স্যারকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন, আমি আপনাকে যেইসব প্রশ্ন করতেছি তা অতি প্রয়োজনেই করতেছি। আপনে কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দেন নাই। কি প্রয়োজনে ছাত্রলীগের মিছিলে গেছিলেন?

আমার এক বন্ধুর হলে সিট পেতে অসুবিধা হচ্ছিলো?

সিট পাইছে।

হ্যাঁ।

কি নাম তার?

আব্বাস উল্লাহ।

ইন্সপেক্টর হাবিব তার নোটবুকে নামটা টুকে নেয়।

আব্বাস উল্লাহ কোন হলে সীট পাইলো?

মুজিব হলে।

রুম নম্বর জানেন?

জানি। ২২৩।

রুম নম্বরটিও হাবিব তার নোটবুকে টুকে নেয়।

আজকের মতো আমার কাজ শেষ। তবে আরো দুই-একবার আসার প্রয়োজন হৈতে পারে। মিস শিরিন, কাউয়া কাউয়ার গোশত খায় না। আপনে সাবেক ডিআইজি সাহেবের মেয়ে, আপনেরে যাতে বেশী বিপদে পড়তে না হয় সেই চেষ্টা আমরা করুম। আপনেরে একটা উপদেশ দেই। ওই খাচ্চৈরা দলটা ছাইড়া দেন।

অপুর ইচ্ছে হয়, ওকে কষে একটা চড় লাগাতে।

নিজের লোক মাইরা রাজনীতি করুইন্যা পার্টি ওইটা। অরা কোনোদিনও ক্ষমতায় যাইবো না।

উপদেশ দেবার জন্য ধন্যবাদ। এন্ড ফর ইওর কাইন্ড ইনফারমেশন, আ'ম টেলিং ইউ ওয়ান্স এগেইন, আ'ম নট ইনভল্বড উইথ এনি পলিটিক্যাল পার্টি। তবে আমি কি করবো না করবো সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার যোগ্যতা আমার আছে।

বয়স হৈলে বুঝবেন। এখন রক্ত গরমতো, বুঝতে পারতাছেন না। দাদারা আপনেগো মতো কচি পোলাপাইনগুলারে প্রগতির পানি দিয়া মগজ ধোলাই কৈরা দিছে। আপনেগো পার্টির মাধ্যমে ইন্ডিয়ার দাদারা এই দেশে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ছড়াইতাছে। আপনেগো হাইকমান্ড কোনোদিনও এই দেশের মঙ্গল চায় না।

অপু মনে মনে ভাবছে, শুয়োরের বাচ্চা গেলি। তুই দেশের মঙ্গল-অমঙ্গলের কি বুঝিস। খালিতো জানিস ঘুষ খেয়ে পেট মোটা করতে।

মুখে বলে, হয়ত আপনি ঠিকই বলেছেন। ভেবে দেখবো।

কথাটা বলে একটু হাসি হাসি মুখ করে অপু।

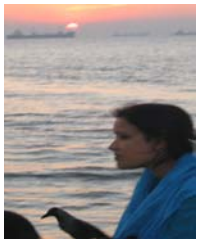

আঘাত যতোটা না তীব্র তার চেয়ে অনেক বেশী ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হলেও খন্দকার পরিবার আপাতত এ ঝামেলা থেকে মুক্ত। এজন্য খন্দকার সাহেবকে হোম মিনিস্টারের সাথে দেখা করে নাকে ক্ষত দিয়ে আসতে হয়েছে। মিথ্যা দোষে অপরাধী সেজে ক্ষমা চাওয়া খুবই অপমানজনক ।

পেটের সন্তানের জন্য সেই অপমান বাবা-মাকে হজম করতে হয়। খন্দকার সাহেব তা হজম করতে পারছেন না। তার বদহজম হয়েছে। বমি বমি ভাব হচ্ছে কিন্তু বমি করতে পারছেন না। বমি করে ফেলে দিতে পারলে ভালো হতো, শান্তি পেতেন। কিন্তু তার কোনো উপায় নেই। তিনি অবসরপ্রাপ্ত ডিআইজি, মানে মরা ঘোড়া। মরা হাতির দাম লাখ টাকা হলেও মরা ঘোড়ার কোনো দাম নেই। সুতরাং মূল্যহীন মরা ঘোড়ার মতো অবসরপ্রাপ্ত ডিআইজিকে বদহজম হওয়া অপমানের টুকরাটি পেটের মধ্যে নিয়েই চলাফেরা করতে হবে। গত পাঁচদিন তিনি শুধু বাড়ি থেকেই না, বলা যায় নিজের ঘর থেকেও তেমন একটা বের হন নাই। শুধু খাওয়ার সময় নিচে নামেন, ডায়নিং টেবিলে বসেন। খেয়ে-দেয়ে আবার ওপরে চলে আসেন। খাওয়ার টেবিলেও তেমন কোনো কথাবার্তা হয় না, অন্যরাও তেমন একটা কথা বলে না। মিলি, মনির, সবাই কেমন চিমসে গেছে। অপুর অবস্থা আরও খারাপ। সে সবার সঙ্গে খেতেও আসে না। খন্দকার সাহেবের মতো একা একা, নিজের ঘরে বসে থাকে। খন্দকার সাহেবের সাথে তার প্রিয় কণ্যা অপুর দূরত্বটা এই ক'দিনে এতোটাই বেড়ে গেছে, যেন বাপ মেয়ে দু'জন এখন দুই মেরুর মানুষ। অপু যেমন ভয়ে বাবার কাছে যায় না, খন্দকার সাহেবও মেয়ের কাছে ঘেষতে ভয় পান। তিনি ভালো করেই জানেন অপু কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না। এক-আধটা মিছিলে-টিছিলে গিয়ে থাকলে সেটা সঙ্গ কিংবা বয়সের স্বাভাবিক কৌতুহলের কারণেই গিয়েছে। এসব কথা তিনি তুলতে চান না। অপুকে এ নিয়ে ঘাটাতে চান না। আর এজন্যই ভয়। মেয়ের মুখোমুখি হলে প্রসঙ্গটা চলে আসতে পারে।

ইজি চেয়ারে শুয়ে শুয়ে খন্দকার সাহেব যখন এসব কথা ভাবছেন তখন টেলিফোন বেজে উঠলো। সিথানের পাশের সাইড টেবিলে রাখা শাদা টেলিফোন সেটটির ভলিউম কমানো আছে, তাই খুব মৃদু শব্দে বেজে চলেছে। তিনি ফোন ধরার জন্য উঠছেন না। ভাবছেন নিচ থেকে কেউ না কেউ ধরবে, প্যারালাল লাইন। এনালগ সেটটা বেজেই চলেছে, কেউ তুলছে না। এবার তিনি কিছুটা বিরক্ত হলেন। ভ্রু কুচকে ইজি চেয়ার থেকে উঠলেন। একপাটি কোলাপুরি চপ্পল উল্টে পড়ে আছে। তিনি সেটাকে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে সোজা করলেন। তারপর কোলাপুরি চপ্পলে পা গলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে তার মনে হলো তিনি পুরোপুরি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন নি, কুঁজো হয়ে আছেন। একটা অপমানের বোঝা তার কাঁধের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে। সেই বোঝার চাপে তিনি হয়ত একসময় আর দাঁড়াতেই পারবেন না। তখন হয়ত তাকে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হবে। তিনি হেঁটে কিংবা হামাগুড়ি দিয়ে টেলিফোন সেটটির কাছে গেলেন। তারপর খাটের ওপর বসে রিসিভার কানে লাগিয়ে বললেন, 'হ্যালো'। তিনি কি হ্যালো বললেন? শব্দটা নিজের কানে কেমন যেনো জিভে আটকে যাওয়া একটা 'ঘেউ'-য়ের মতো শোনালো, অথবা একটা গোঙানির মতো আর্তনাদ। ওপাশ থেকে উচ্ছাসের হর্ষধ্বণি শোনা যাচ্ছে।

স্যার, আমি আলী আহমদ বলছি। নবীনগর থেকে। স্যার, আমার ছেলেরা নবীনগর জয় করে ফেলেছে। তিতাসের বুক চিরে আমার ছেলেরা, হামিদা খন্দকার হাই স্কুলের সোনার ছেলেরা স্যার, দাঁড়াশ সাপের মতো সরোঙ্গা ছুটিয়ে বাইচের ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে গেছে। স্যার, শুনতে পাচ্ছেন স্যার? আমি এই খুশির খবরটা আপনাকে দেওয়ার জন্য টেলিফোন একচেঞ্জ অফিসে ছুটে এসেছি। স্যার শুনতে পাচ্ছেন, হ্যালো, হ্যালো....হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন?

হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি হেডমাষ্টার সাহেব। আপনি বলেন।

স্যার, কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা আনন্দ মিছিল বের করবো। কনিকাড়া হামিদা খন্দকার হাই স্কুলের ব্যানার নিয়ে আনন্দ মিছিল। আপনাকে খুব মিস করতেছি স্যার। আপনি খুশি হন নাই স্যার?

প্রশ্নটা করার সময় আলী আহমদের কণ্ঠটা যেন হঠাৎ আকাশ থেকে পাতালে নেমে গেলো।

নিশ্চয়ই খুশি হয়েছি। খুশি হবো না কেন হেডমাষ্টার সাহেব। কনিকাড়া হামিদা খন্দকার হাই স্কুল নবীনগর থানার মধ্যে নৌকা বাইচে প্রথম হয়েছে, এটাতো আনন্দের কথা। কতো বড় সম্মানের কথা।

জ্বি স্যার, বিরাট সম্মানের কথা। এমপি আনোয়ার সাহেবও চলে এসেছেন খবর পেয়েছি। তিনিই পুরস্কার প্রদান সিরিমনিতে প্রধান অতিথি হিসাবে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন। এমপি সাহেবের হাত থেকে আমরা পুরস্কার নিবো, প্রথম পুরস্কার। ২১ ইঞ্চি রঙিন টেলিভিশন। আপনাকে স্যার বলেছিলাম না, আমার ছেলেরা পারবে?

ফোন রেখে দেয় এ কিউ খন্দকার। ইচ্ছে হচ্ছে এখনি একবার নবীনগর ছুটে যেতে। কনিকাড়া হামিদা খন্দকার হাইস্কুলের ছেলেদের সাথে আনন্দ মিছিলে শরীক হয়ে স্লোগানে গলা মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে,

জিতেছে গো জিতেছে
কনিকাড়া জিতেছে।

ছেলেবেলায় কতো দূরের ফিল্ডে কনিকাড়া গ্রামের ফুটবল দলের সাথে হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতো কুদ্দুইচ্চা। সে কি টান টান উত্তেজনা। কনিকাড়া টিম একটা গোল দিলে আনন্দে ব্যান্ড বেজে উঠতো। আর দল জিতলে শীল্ড নিয়ে সারা পথ স্লোগান দিতে দিতে, কনিকাড়া গ্রামের হাজারো প্রশস্তি গাইতে গাইতে, নাচতে নাচতে গ্রামে ফিরে আসতো আনন্দ মিছিল নিয়ে। আব্দুল কুদ্দুস খন্দকারের আজ এতো বছর পর আবার সেই কুদ্দুইচ্চা হয়ে আনন্দ মিছিলে যোগ দিতে ইচ্ছে করছে। সমস্ত নবীনগর উপজেলা শহরটা প্রদক্ষিণ করে বীরদর্পে আনন্দ মিছিলটা ছুটে যাবে কনিকাড়ার দিকে। শত শত মানুষ কাঁচা সড়কের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া আনন্দ মিছিলের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে। মুরুব্বীদের কেউ কেউ বলবে, খনকারের বেডা একটা কামের কাম করছে, গেরামে ইশকুল দিছে। সন্দেহের দৃষ্টিতেও কেউ কেউ তাকাবে। ফিসফাস করে বলবে, খনকারের পুতে ইলেকশনে খাড়াইবোনি? অসংখ্য মুগ্ধ চোখ, অসংখ্য সন্দিগ্ন চোখ, ছোট ছোট শিশুদের বিস্মিত চোখ, গাঁয়ের বৌ-ঝিদের কৌতুহলি চোখ পেরিয়ে আনন্দ মিছিল গিয়ে পৌছাবে কনিকাড়া হামিদা খন্দকার হাইস্কুলের উঠানে। সেখানে একটা ছোটোখাটো উৎসব শুরু হবে। হয়ত হেডমাষ্টার আলী আহমদ লাঠি খেলা বা এ জাতীয় কোনো আনন্দ ইভেন্টের আয়োজন করেই রেখেছে। এক পর্যায়ে হেডমাষ্টার ভিড়ের মাঝখানে একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আদপের সাথে ঘোষণা করবে, আজকের এই বিশেষ দিনে, কনিকাড়া গ্রামের বিজয়ের দিনে, আপনাদের উদ্দেশ্যে অতি মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন কনিকাড়া হামিদা খন্দকার হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান অত্র এলাকার গর্ব নবীনগরের সুসন্তান সাবেক উপমহাপুলিশ পরিদর্শক জনাব আব্দুল কুদ্দুস খন্দকার সাহেব।

এসবের কিছুই ঘটে না। কারণ খন্দকার সাহেব সিদ্ধান্ত নেন তিনি নবীনগর যাবেন না। অপুর সঙ্গে তার সম্পর্কটা স্বাভাবিক হয়ে আসা দরকার। কচি বয়সে মেয়েটার মনের ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়লে বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

দরোজা ভেজানোই ছিলো। দুটো টোকা দিয়ে ভেতরে ঢোকেন খন্দকার সাহেব। অপু যুগপৎ অবাক হয়। এ বাড়ির একটি রেয়ার ঘটনা, এ কিউ খন্দকার দুই মেয়ের কারো ঘরে ঢুকেছেন। কালে-ভদ্রে এ রকম ঘটনা ঘটে থাকে হামিদা লজে। সাধারণত দরকার হলে তিনি মেয়েদেরকে তার রুমে ডেকে পাঠান। অবশ্য মেয়েদের সঙ্গে তার যাবতীয় কথাবার্তা হয় নিচে, খাওয়ার টেবিলে। গত এক সপ্তাহ ধরে অপু সবার সঙ্গে খেতে বসছে না বলে বাপ-মেয়ের মধ্যে একটা শত মাইলের দূরত্ব তৈরী হয়েছে।

দুপুরের পর থেকে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। সন্ধ্যা হয়েছে কি হয় নি ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ইলশেগুড়ি চলছে যদিও, আকাশ ভারী মেঘে আচ্ছন্ন। ঘন মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে শেষ বিকেলের সবটুকু আলো। অপু উঠে দাঁড়ায়। খুব শিগগীরই যে বাবার মুখোমুখি হতে হবে এটা ও জানতো। কিন্তু তিনি যে একেবারে ওর ঘরে এসে হানা দেবেন এটা আন্দাজ করতে পারে নি অপু। শুধু তটস্থ ছিলো কখন ডাক আসে বাবার ঘর থেকে। খন্দকার সাহেব তাকিয়ে আছেন ওয়াডরোবের ওপরে রাখা মুরানো ক্রিস্টালের ছোট্ট ফ্লাওয়ার ভাসটির দিকে। কতগুলো বছর পেরিয়ে গেছে। অপুর তখন জন্ম হয় নি, মিলিও খুব ছোট। ইতালীর তুরিনে একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের অফার পান এডিশনাল এসপি কুদ্দুস। অনেক দেন-দরবার করে অনুমতি মেলে স্ত্রী-কণ্যাকে সাথে নেবার, সঙ্গে দু'সপ্তাহের ছুটি। পিজার হেলানো টাওয়ার, রোমের কলুসিয়াম, ভেটিকান সিটি এবং রোমান সাম্রাজ্যের রাজপ্রাসাদ পেলাটিনা দেখে শেষে গিয়ে পৌছান এক বিস্ময়কর শহর ভেনিসে। সেক্সপিয়ারের মার্চেন্ট অব ভেনিস পড়ার সুবাদে ভেনিস নামটির সাথে পরিচয় ঘটেছে অনেকেরই কিন্তু স্বচক্ষে ভেনিস দেখা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। ইতালীয়ানরা বলে ভেনিজিয়া। একটি ফ্লোটিং সিটি। জলের ওপর ভাসছে শহরের সব বাড়ি-ঘর, অফিস আদালত, হোটেল-রেস্টুরেন্ট, স্কুল-প্রার্থনালয়। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাওয়ার জন্য রয়েছে

ট্রেডিশনাল নৌকা গন্ডুলা, আছে নানান আকৃতির প্রাইভেট এবং পাবলিক বোট। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে ভেনিজিয়ানরা ওই ইঞ্জিনচালিত বাণিজ্যিক বোটগুলোকে বোট বলে না, বলে ট্যাক্সি। একথা শুনে চার বছরের মিলি হঠাৎ আঙুল তুলে একটি বড়সড় লঞ্চ টাইপের বোট দেখিয়ে বলে,

বাবা, ওই যে দেখো বাস।

এই বয়সে মেয়ের সেন্স অব হিউমার এবং প্রত্যুৎপন্নমতিতা দেখে অবাক হন হামিদা ও কুদ্দুস। মেয়ের দুই গালে আবেগে চুমু খান দুজনই একসাথে। যতবারই কথাটা মনে পড়েছে, হাঁটতে হাঁটতে ওরা যখন সেন্ট মার্কোর (ভেনিজিয়ানরা বলে সান মার্গো) দিকে যাচ্ছিলেন, বারবারই গোপন করে রাখা হাসির ঝাপিটার মুখ খুলে যাচ্ছিলো দুজনেরই। এতে মিলিও খুব মজা পায়। বাবা-মায়ের হাসিমুখই যে শিশুদের সবচেয়ে প্রার্থিত পুরস্কার এটা মিলির আনন্দ দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো। সান মার্কোতে পৌঁছে ওদের মনে হয় ওরা বুঝি স্বর্গে পৌঁছে গেছে। অপূর্ব! যেন ফ্রেমে বসানো কতগুলো ছবি। ভেনিস শহরে কোনো স্থলযান নেই, কয়েকটি রাস্তা আছে পায়ে চলার জন্য। যে কারণে পলিউশন নেই একেবারে। তার ওপর পুরো শহরটা ভাসছে এদিগে এবং পিয়াভ নদীর মাঝখানের নীল লেগুনের ওপর। সান মার্কো একটি বিরাট স্কয়ার। একপাশে সুবিশাল গির্জা, অন্য তিনদিকে রাজ-প্রাসাদ। তারই এক ফাক গলে ছুটে যাওয়া উঠোনটি ঝপাৎ করে নেমে গেছে লেগুনে। কিছুদূর লেগুনটা সাঁতরে পার হয়ে আবার যেনো উঠোনটা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ওপারে চোখ ধাধানো সব ঝকমকে প্রাসাদের সারি। সান মার্কো স্কয়ারের বিশাল উঠোনটি হাজার হাজার নির্ভয় পায়রার পাখা ঝাপটানি আর বাকুম বাকে মুখর এক পায়রাদের অভয়ারণ্য। ইয়াসিকা থার্টি ফাইভ ক্যামেরায় পাগলের মতো ছবি তুলতে শুরু করলেন কুদ্দুস, যেনো এই অপরূপ সৌন্দর্যের পুরোটাই ধরে ফেলবেন ওই ক্ষুদ্র বাক্সটিতে।

এরপর ওরা জলট্যাক্সিতে চড়ে রওনা হলো মুরানো দ্বীপের উদ্দেশে। সেন্ট মার্কো থেকে মুরানো দ্বীপে যাওয়ার পথে ডানদিকে একটি নীরব বৃক্ষশোভিত চিরশান্তির দ্বীপ। ওইদিকে আঙুল তুলে ড্রাইভারকে প্রশ্ন করলেন হামিদা,

ওই দ্বীপে মানুষ থাকে না?

হ্যাঁ থাকে, ওরা সব ঘুমন্ত মানুষ।

বোটচালকের হেয়ালীটা ভালো করে বুঝতে না পেরে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে হামিদা এবং কুদ্দুস দুজনই একসঙ্গে তাকিয়ে থাকে ওর ফর্শা মুখটার দিকে।

আবারো ঘুরিয়ে কথা বলে ড্রাইভার।

আমরা সবাই একদিন ওই দ্বীপে যাবো, একটি দীর্ঘ ঘুমের জন্য।

এবার ওরা বুঝতে পারে এই নিঝুম নীরবতার রহস্য।

এর নাম ডেথ আইল্যান্ড, জানায় বোট চালক।

ডেথ আইল্যান্ডকে পাশ কাটিয়ে ওরা এগিয়ে গেছে অনেকদূর। জলাশয়ের এ অংশটিকে আর মোটেও কোনো লেগুন বা লেক মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এক সুবিশাল সমুদ্র। এই সমুদ্রের বুকে, বাঁ দিকে, হঠাৎ ভেসে ওঠা এক দ্বীপে চোখ গেলো সকলের, ওটাই মুরানো দ্বীপ। মুরানো দ্বীপে এসে যখন ওরা পৌঁছালো তখন বেলা এগারোটা।

দ্বীপের ভেতরে আঁকা-বাঁকা অসংখ্য প্রবাহিত খাল বা ছোট নদী, যেগুলির ওপর রয়েছে বিভিন্ন ক্ষমতার সেতু। প্রতিটি খাল বা নদীর দুপাশেই রয়েছে পায়ে চলার জন্য বাঁধানো পথ। সমস্ত দ্বীপ জুড়ে শত শত ক্রিস্টালের দোকান। যত দেখে ততই বিস্মিত হয় ওরা। কুদ্দুসের কৌতুহলে সাড়া দিয়ে এক দোকানী ওদেরকে নিয়ে যায় ফ্যাক্টরীতে। তিনজন মাত্র ওয়ার্কার, দেখে মনে হচ্ছে একজন ওদের দলপতি, অন্য দুজন সহকারী। দলপতির লম্বা চুল উদোম পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে, মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফ, বড় বড় ভ্রু-র চুল গোল চশমার কাচের ওপর দিয়ে এলোপাথারি বেরিয়ে আছে ছোচা বেড়ালের গোঁফের মতো।

ও-কি ওরার্কারদের সর্দার?

কুদ্দুসের এ প্রশ্নে ঠোঁটে আঙুল চাপা দেয় দোকানী।

চুপ চুপ। ওয়ার্কার বলো না। ওরা হলো শিল্পী, আর এটা কোনো ফ্যাক্টরী না। এটা হলো স্টুডিও। দে আর ভেরি মুডি আর্টিস্ট। মুড ভালো না থাকলে কাজ করে না। ওদের ওপর আমাদের কোনো কন্ট্রোল নেই। দেখছো না কি নিখুঁত শিল্পকর্ম করছে।

কুদ্দুস এবং হামিদার দেখাদেখি মিলিও ঝুঁকে পড়ে দেখে, মুডি আর্টিস্ট তখন ব্যস্ত ক্রিস্টালের গায়ে হাত বুলিয়ে ভেনাসের আদল বের করে আনতে। যেনো ও ঝুঁকে পড়ে মিনতি করছে, বেরিয়ে এসো দেবী, বেরিয়ে এসো।

সেই শিল্পীর তৈরী এই ছোট্ট ফ্লাওয়ার ভাসটির দিকে তাকিয়ে আজ এতো বছর পর সেদিনের এডিশনাল এসপি কুদ্দুস জীবনের শেষ বিকেলে এসে কার কথা ভাবছে? হামিদার কথা? যাকে ভালোবেসে ও ভেনাস বলে ডাকতো। স্ত্রীর বিরহে যেনো ক্রমশই কাতর হয়ে পড়ছেন এ কিউ খন্দকার। বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ লাগছে।

অপু কি ওর পিতার মাইন্ড রিড করতে পারলো? এগিয়ে এসে বাবাকে ও পেছন দিক থেকে জাপটে ধরে। তারপর ঢুকরে কেঁদে ওঠে। খন্দকার সাহেব তার কান্নার ঢেউটিকে নিজের ভেতরে আঁড়াল করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। তিনি মেয়েকে বুকে টেনে নেন। তারপর ওর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেন,

আমি জানি, আমার মেয়ে কোনো ভুল কাজ করতে পারে না।

সিদ্ধান্ত নেয় অপু, কাল থেকে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া শুরু করবে। সকাল থেকে ওর কানের কাছে গীর্জার ঘন্টাধ্বণীর মতো একটি কথাই কেবল বেজে চলেছে, 'আমার মেয়ে কোনো ভুল কাজ করতে পারে না'। বাবার এই আত্মবিশ্বাসকে ও কিছুতেই ম্লান হতে দেবে না। ওকে পড়াশোনাটা শেষ করতে হবে। ভালো রেজাল্ট করতে হবে। তার আগে নিজেকে বদলে ফেলতে হবে। অমিতকে নিয়ে ওর ভাবনার ঘুড়ি আকাশের অনেক ওপরে উঠে যায়। এই ঘুড়ি নিয়ে ও প্যাচ খেলতে পারবে না, খোয়ানোর ভয় ওকে নেকড়ের মতো তাড়া করে। বাবা কি ওকে মেনে নেবেন?

মিলিকে ও সব খুলে বলে।

বলিস কি, এতো দেখি লাইলি-মজনুর প্রেম।

মিলি খুব একটা অবাক হয় না। অপুর যা বয়স, এ বয়সে কাউকে ওর ভালো লাগতেই পারে। তবে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে জীবনকে নষ্ট করে ফেলার রিস্কও থাকে এ বয়সে। ওকে বোঝাতে হবে, চেনাতে হবে জীবনের সব গলি-ঘুপচি।

কিন্তু ছেলেটার সঙ্গে তোর কোনো কথা হয় নি বলছিস?

না।

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ে অপু

অপু, তোকে আমি কিছু কথা বলবো। মন দিয়ে শুনবি।

বল।

তুই এখনো খুব ছোট। জীবনের অলি-গলি চিনবার বয়স তোর এখনো হয় নি। আর ছেলেদের দৃষ্টি বুঝতে অভিজ্ঞতা লাগে।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তুমি আসলে কি বলতে চাইছো।

একটি ছেলে তোর দিকে তাকালো। এটার নানান কারণ থাকতে পারে।

কি কারণ?

তাকালেই প্রেম হয়ে যায় না। ধর তোর বয়সী ওর একটা ছোট বোন ছিলো। সেই বোনটাকে ও অনেকদিন আগে হারিয়ে ফেলেছে। তোকে দেখামাত্র সেই বোনটার কথা মনে পড়ে গেল। আর অমনি সে তোর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

সিনেমার গল্প বলো না আপু।

মোটেও সিনেমার গল্প বলছি না। আমার ধারণা ব্যাপারটা সে রকম কিছুই।

মোটেও ব্যাপারটা সে রকম কিছু না। এটা তুমি ভালো করেই বুঝতে পারছো।

না, বুঝতে পারছি না। তুই কি করে বুঝলি যে ব্যাপারটা অন্য কিছু?

চোখ দেখে। ওর চোখ অন্য কিছু বলছিলো।

অচ্ছা, তাহলে তুমি চোখের ভাষাও পড়তে শিখেছো..

হ্যাঁ শিখেছি। কারণ, 'চোখ যে মনের কথা বলে'

অপু সুর করে গানের কলিটি গেয়ে উঠলো। পরক্ষণেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আহ্লাদি সুরে বললো,

আপু, আমিতো ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, নাকি? তোমার কি ধারণা জগৎ সংসারের কিছুই আমি বুঝি না?

হয়েছে হয়েছে আর পাকামো করতে হবে না। তুমি তোমার মজনুকে নিয়ে থাকো, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। আমি গেলাম।

মিলি খাট থেকে উঠে দাঁড়ায়। অপু ওর হাত টেনে ধরে।
আপু, আমি এখন কি করবো?
মিলি ওর মাথার চুলে আলতো একটা ছোঁয়া দিয়ে বলে,
পড়াশোনা কর। টাইম উইল শো ইউ দ্যা ওয়ে।
গলার গাম্ভীর্যটা ছেড়ে দিয়ে এবার একটু ক্যানক্যানে গলায় বলে,
রিণার মতো আবার ভেগে-টেগে যাস না যেনো।

কথাটা ঠাট্টাচ্ছলে বললো বটে কিন্তু মেসেজ যা দেবার তা ও অপুকে ঠিকই দিয়েছে। আর এই মেসেজটি রিসিভ করার মতো শার্প এন্টেনাও অপুর আছে। সুতরাং কমিউনিকেশন ঠিকমতোই ঘটলো। বাবাও কি ওই রকম ইঙ্গিতই দিলেন? যাতে ওকে নিয়ে ভবিষ্যতে হামিদা লজে নতুন কোনো টেনশন ক্রিয়েট না হয়।

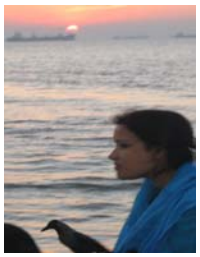

বন্ধ দরোজা খুলে যাওয়ায় সে দরোজা দিয়ে হুড়মুড় করে এখন ঢুকে পড়ছে সবাই, সবকিছু। সুন্দর, অসুন্দর, অসুর, দেবতা, দেবী, মানবী, রাক্ষসী, প্রজাপতি, বিষাক্ত পোকামাকড়, পিপড়াঁ, আরশোলা সব। অমিতের জন্য এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। যা দেখে তা-ই ভালো লাগে। হৃদয়ের, মনের, মস্তিস্কের ধারণ ক্ষমতা যেন প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে জ্যামিতিক হারে। সবাইকে, সবকিছুকেই ওর ভালো লাগে, ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। যেন ভালোলাগাই আনন্দ, ভালোবাসাই জীবন।

গুলশান এক নম্বরে এসে টেম্পু থেকে নামে অমিত। তারপর হাঁটতে শুরু করে বাড্ডার দিকে। গুলশান লেকটার মাঝখানে এসে ওর মনে হয় ছিয়াত্তুর সালে ওরা যখন বাড্ডায় আসে তখন লেকের ওপর এই রাস্তাটা ছিলো না। লেকটাও ছিলো আরো অনেক বড়, অনেক প্রশস্ত। নাকি ও ছোটো ছিলো বলে লেকটাকে তখন বড় মনে হতো? ঠিক বুঝতে পারে না অমিত। লেকের ওপারে, বাড্ডার দিকের ওই জায়গাটাকে বলা হতো গুদারাঘাট, নামটা এখনো আছে তবে গুদারার কোনো ব্যাবস্থা নেই। এই নগরায়ন সভ্যতার জন্য আশির্বাদ না অভিশাপ? জলাশয় শুকিয়ে গেলে কি হবে? একটা আর্টিকেল পড়েছিলো অমিত, বিদেশী কোনো ম্যাগাজিনে। পৃথিবীর সব মৃত নগরীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, প্রথমে জলাশয়গুলি শুকিয়ে যায়, তারপর শুরু হয় মরুকরণ। গাছগুলি মরতে শুরু করে, আক্সিজেনের অভাবে ধীরে ধীরে প্রাণীকূল মরে উজাড়। তারপর ধূলিঝড়, মরুঝড়ে শহরগুলি ঢাকা পড়ে ধুলা-বালির নিচে। ঢাকা শহরেরও কি একদিন ওই দশা হবে? মানুষ যেভাবে খাল-বিল ভরাট করে গড়ে তুলছে বৈধ-অবৈধ ইমারত, এর প্রতিশোধ কি প্রকৃতি নেবে না? নিশ্চয়ই নেবে। উন্নত দেশগুলি এজন্যই বোধ হয় শহরের ভেতরে আর্টিফিশিয়াল খাল-বিল, লেক, নদী তৈরী করে। আর আমরা, অভাগা জাতি, প্রাকৃতিক জলাশয়গুলি ভরাট করে ফেলছি। গুলশানের ওই সুন্দর বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে তবু ওর ভালোই লাগে। ভালো লাগে সরু হয়ে যাওয়া লেকটাকেও।

রিজভীর সাথে পথেই দেখা হয়ে গেলো অমিতের। ওর বাসায়ই যাবে ভাবছিলো। রিজভীর কাছ থেকে কিছু বুদ্ধি পরামর্শ নেওয়া দরকার। গত দু'সপ্তাহ ধরে অনেক ভেবেছে। ও মোটামুটি নিশ্চিত অপু ওর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে না। কিন্তু প্রস্তাবটা দেবে কি করে তা ও ভেবে ঠিক করতে পারছে না। একবার ভেবেছিলো চিঠি লিখবে, পরে সিদ্ধান্তটা বাতিল করে দেয়। খুবই ব্যাকডেটেড একটা গ্রাম্য চিন্তা। সরাসরি কথা বলতে হবে। কোথায়, কখন, কিভাবে কথাটা বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। বেশী দেরী হলে ফসকেও যেতে পারে, এই ভয়টাও আছে। ফোনে অনেকবার ট্রাই করেছে, অপু ফোন ধরছে না। হয় ওর বাবা ধরে, না হয় ওর বড় বোন। আর তখনি ওর বুকটা ঢিপঢিপ করতে থাকে। এই ভয়টাকে তাড়াতে হবে, ভীতু ছেলেদের মেয়েরা একদম পছন্দ করে না, কথাটা রিজভীই ওকে বলেছিলো।

কিন্তু রিজভী জানালো এখন ওকে সময় দিতে পারবে না। ও এখন যাচ্ছে সুরকার প্রনব ঘোষের বাসায়, ইন্দিরা রোডে। ডলির নতুন অ্যালবামের জন্য ও গান লিখেছে। সেই গানে সুর করাতে হবে। নতুন অ্যালবামের নাম রেখেছে 'কালিয়া'। রিজভীর একশ পার্সেন্ট আত্মবিশ্বাস এই ক্যাসেট সুপার হিট হবে। আর সাথে সাথে গীতিকার হিসাবে ও উঠে আসবে এক নম্বরে। নজরুল ইসলাম বাবুর সাথে টক্কর দিতে হবে, না হলে বাজারে টিকে থাকা যাবে না। মিউজিক লাইনে টিকে থাকা খুবই কঠিন। ইদানিং ও একটা নতুন ধান্দা বের করেছে। বিভিন্ন শিল্পীর অ্যালবামের অ্যারেন্জার হিসাবে কাজ করছে । ডলির হাজব্যান্ড হওয়ার সুবাদে শিল্পীদের সাথে একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ওর। এই সম্পর্কটাই পুঁজি। শিল্পীদের যা পারে নগদ দিয়ে গান গাওয়ায়। সেই গান রেকর্ড করে ক্যাসেট কোম্পানির কাছে ডাবল দামে বিক্রী করে। ব্যাবসায়ীক মাথা খুব পরিস্কার ওর। মধ্যম পর্যায়ের ছাত্র ছিলো। আই এস সি পাশ করে আর পড়লো না। কিন্তু জীবনটাকে কেমন সাজিয়ে ফেলছে। ভাবসাব দেখে মনে হয় ক'দিনের মধ্যেই গাড়ি কিনে ফেলবে। অমিত প্রশ্ন করে,

এই কাজে পুঁজি লাগে না? শিল্পীর টাকা, স্টুডিওর ভাড়া, সুরকারের টাকা, হ্যান্ডসের টাকা। ম্যালা পুঁজির ব্যাপার।

রিজভী পকেটের টেকা দিয়ে ব্যাবসা করে না, বুঝলা বন্ধু। কৈয়ের তেলে কৈ ভাজি। কোম্পানীর কাছ থিকা অ্যাডভান্স লই। হেই টেকায় কাম শেষ। পরে লই লাভের টেকা।

তয় কোম্পানীগুলা নিজেরা এই কাম করে না ক্যা?

শিল্পীরা হৈলো হারামীর হাড্ডি। শিডিউল মেন্টেইন করে না। আর কোম্পানীর মালিকগুলা হৈলো চামার, সব ঢাকাইয়া, ব্যবহার জানে না। ফায়দাটা লই আমি। আমার লগে শিল্পীরা হারামীপানা করতে পারে না, ডলির জামাই না? ডলি হৈলো গিয়া অহন সুপার হিট আর্টিস্ট। আর তাছাড়া আমার কাছ থিকা ভালো ব্যাবহারও পায়।

আর ক্যাসেট কোম্পানী?

অরাও আরামে থাকে। দুই পয়সার শিল্পীগো পিছে পিছে ঘুরন লাগে না। ঘরে বৈয়া মাল পায়।

অমিত বিস্মিত হয় রিজভীর কথা শুনে। ছেলে শুধু মেয়ে পটাতেই ওস্তাদ না, জীবন গোছানোর তরিকাতেও এক নম্বর। অমিত অবশ্য ওর এই ধান্দার মধ্যে খারাপ কিছু দেখতে পায় না। পিউর বিজনেস।

অপুদের বাড়ির সামনে এসে হাঁটার গতিটা কমিয়ে দেয় অমিত, আসলে ও কমায় না, এমনিতেই কমে যায়। একটা ভালোলাগা বোধে অবশ হয়ে আসে ওর পা দুটো। একঘন্ড মেঘ শেষ বিকেলের রক্তিম সূর্যের ওপর গড়িয়ে পড়ে। ঝুপ করেই যেনো সন্ধ্যা নেমে যায়। অমিত স্টিলের সবুজ গেটের ওপর দিয়ে, যেখানে রক্তজবা ফুলের একটি ডাল রঙধনুর মতো বেঁকে আছে, একটু চোরাগুপ্তা উঁকি মারার চেষ্টা করে। এটা ও রোজই করে, অজান্তেই ওইদিকে চোখ চলে যায়। আর তখনি একটি ডাচ শেফার্ড ঘেউ ঘেউ করতে করতে চেচিয়ে ওঠে। এ বাড়িতে কুকুর আছে এটা ওর জানা ছিলো না। হয়ত নতুন আনা হয়েছে। কেউ একজন ভেতর থেকে ‘কে কে’ বলে চিৎকার করলে আমিতের বুক ধরফর করতে থাকে। উটকো অপমানের হাত থেকে বাঁচার জন্য ও দ্রুত পা চালায়। লাক মোটেও ফেভার করছে না। কিছুতেই অপুর সঙ্গে দেখা হচ্ছে না।

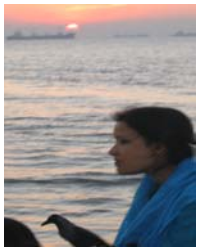

খেতে বসে কিছুই ভাল্লাগছে না অমিতের। কই মাছের দোপেয়াজা ওর প্রিয় খাবার। সেই প্রিয় খাবারও মুখে তুলতে ইচ্ছে করছে না। কেন করছে না বুঝতে পারছে না অমিত। সাধারণত কারো সাথে ঝগড়া, কথা-কাটাকাটি এ জাতীয় ঘটনার পরে মন খারাপ হয়। তখন কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না। অমিতের আজ কারো সঙ্গেই এমন কোনো ঘটনা ঘটে নি। তাহলে অমন লাগছে কেনো? কোনো জবাব খুঁজে পায় না ও। বাঁ হাত কপালে তুলে টেম্পারেচার পরীক্ষা করে। ঠিকই আছে, গা-ওতো গরম না। খেতে ইচ্ছে না হওয়ার কোনো যুক্তি খুঁজে পায় না। মাঝে মাঝে সম্ভবত কোনো কারণ ছাড়াই এমন হয়। কোনো কিছুই ভাল্লাগে না। কিন্তু অমিতের এখন সেই সময় না, ওর এখন সব কিছু ভালো লাগার সময়। তবু ওর খারাপ লাগে এবং খারাপ লাগার মাত্রাটা বাড়তেই থাকে। অমিত জানে এর কারণ খুঁজে লাভ নেই। কারণ প্রকৃতি তার সব রহস্য মানুষের হাতে তুলে দেয় নি। কিছু কিছু নিজের হাতে রেখে দিয়েছে। এটিও প্রকৃতির সেই মুষ্ঠিবদ্ধ রহস্যগুলির একটি।

অমিত জানে মনটাকে ভালো করার জন্য ওকে এখন কার কথা ভাবতে হবে। কিন্তু অপুর কথা ভাবতেই ওর আরো ডাবল মন খারাপ হয়ে যায়। ব্যর্থতাবোধে আচ্ছন্ন হয়ে যায় মন। মুখের মধ্যে একটা স্যাকামাইসিন স্যাকামাইসিন ভাব আসে। শায়লা এতক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলো ও কিছুই খাচ্ছে না। গত কয়েকদিন যাবৎ ও কেমন যেনো বদলে যাচ্ছে। আগের মতো হৈ চৈ করছে না। রুমাল খুঁজে না পেলে কারো ওপর রেগে যাচ্ছে না। আর সারাক্ষণ গুন গুন করে কি সব ইংলিশ গান করে । মাথা টাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে না-তো? চারজনের সংসারে একজন পাগল। পঁচিশ পার্সেন্ট পাগলের সংসার। বড়ই বিপদের কথা।

কি হয়েছে অমি?

ভাবনার তার ছিঁড়ে যায় অমিতের। মাত্র অপুকে বাইকের পেছনে বসিয়ে স্টার্টার সোজা করে কিক দিয়েছে আর অমনি ভাবী ডেকে উঠলেন। দুধের মধ্যে চনার ফোটা। একটা বেরসিক ধরণের কাজ হয়ে গেলো।

অমিত শায়লার প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে প্লেটের ভাতগুলো নাড়াচাড়া করছে। যেনো চাল থেকে ধান বাছতে বসেছে।

কি হলো অমি খাচ্ছো না?

ভাবী ভাল্লাগছে না।

কথাটা বলেই কেমন ওর কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করলো কিন্ত অমিত তা করে না। অনেক কষ্টে আবেগের লাল ঘোড়াটার লাগাম টেনে ধরে।

কেনো, তরকারী ভালো হয় নি? একটা লেবু নাও। এলাচি লেবু। ঘ্রাণে রুচি বাড়বে। আচার দেবো? আচার নিলে ভালো লাগবে।

দাও। টকটা দিও।

বয়ম থেকে এক ফালি আমের আচার অমিতের প্লেটে তুলে দিতে দিতে শায়লা ফিক ফিক করে হাসে।

এতো টক খাও। তোমার খবর আছে।

কেন, টক খেলে কি হয়?

সময় হৈলেই বুঝবা।

বলেই শায়লা আবারো হাসে। এবারের হাসিটা অন্যরকম। একটা রহস্যের গন্ধ পায় অমিত।

শায়লার সাথে অমিতের সম্পর্কটা অনেকটা বড়বোন ছোটভাইয়ের মতো। বয়সে ওর চেয়ে বড়জোর বছরখানেকের বড় হবে শায়লা। সম্পর্কটা হওয়া উচিত ছিলো বন্ধুর মতো, স্বাভাবিক সম্পর্ক। এটা সেটার জন্য ভাবীর ওপর ও প্রায়ই ঝাল ঝাড়ে কিন্তু অপুর বিষয়টা খুলে বলার মতো সম্পর্ক শায়লার সাথে ওর তৈরী হয় নি।

ডায়নিং স্পেসের সাথেই শায়লার ঘর। ওখান থেকে কান্নার শব্দ আসছে। মাইশা কাঁদছে।

তুমি খাও আমি মাইশাকে ঘুম পাড়িয়ে আসি।

মাইশার কান্না থামাতে শায়লা উঠে গেলো।

অমিত ভাতের প্লেটে হাত রেখেই মোটর সাইকেলে স্টার্ট দেয়। ফার্স্ট গিয়ার, সেকেন্ড গিয়ার, থার্ড গিয়ার, টপ গিয়ার। বাইক ছুটে চলেছে এক'শ কিলোমিটার বেগে। অপুকে পেছনে বসিয়ে অমিতের স্বপ্নের বাইক পাখা মেলে আকাশে উড়তে শুরু করে। একটা দুষ্টামি বুদ্ধি আসে ওর মাথায়। এখন ব্রেক করলে কেমন হয়। অমিত ব্রেক করে। ভারসাম্য ঠিক রাখতে না পেরে অপুর নরোম বুকটা ওকে চেপে ধরে। অমিত মজা পায়। জিনসের আঁটসাঁট প্যান্ট আর টি শার্টে ওকে খুব সেক্সি লাগছে। অপুর শরীরের নানান রহস্যময় ভাঁজগুলো ওর দেখতে ইচ্ছে করে। ওর গায়ের গন্ধ, বিশেষ বিশেষ জায়গার গন্ধ নিতে ইচ্ছে করে। এই মজা পাওয়াটা কিংবা অপুকে সেক্সি লাগা বা ওর শরীরের গন্ধ নেবার এই অদম্য ইচ্ছেটাকে কি পার্ভারশন বলে ? পার্ভারশনের সংজ্ঞা কি ? নেদারল্যান্ডের আইনে ভাই-বোনের বিয়ে স্বীকৃত। পশ্চিমা বিশ্বে ভাই-বোন, বাপ-বেটা একসঙ্গে বসে সেক্স নিয়ে আলাপ করে। ন্যুড বিচগুলোতে নারী-পুরুষ একসাথে নেংটো হয়ে হাঁটা চলা করে। এগুলো যদি পার্ভারশন না হয়, তাহলে একটি যুবক আরেকটি যুবতীর দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকালে দোষ হবার কোনো কারণ নেই। নিজেই সিদ্ধান্ত নেয় অমিত। যুক্তিগুলো ওকে খানিকটা স্বস্তি দেয়।

কি চমৎকার শরীর অপুর। ওর নরোম বুক অমিতের পিঠে, থেকে থেকেই চেপে বসছে। অদ্ভুত এক শিহরণ ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। যেনো সমস্ত শরীরটা এক দীর্ঘ ঘুমের পরিতৃপ্তি নিয়ে একটু একটু করে জাগতে শুরু করেছে। এবার অপু ওর কোমল হাত দুটি দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে। এতে ওর একটু সুড়সুড়ি লাগে, সেই সুড়সুড়িটাই একসময় আনন্দময় এক গভীর শিহরণ হয়ে ওকে ভালোলাগার এক অচেনা স্বর্গের পথে টানতে থাকে। টি-শার্ট আর প্যান্টে কী অপূর্ব লাগছে অপুকে। মেয়েদেরকে ছেলেদের পোশাকেই বেশী সুন্দর, স্মার্ট লাগে। একটা বারো হাত শাড়ি পেচানো মেয়েগুলোকে দেখলে ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। খেত খেত লাগে।

মাইশার পেটের আগুন নিভিয়ে ডায়নিং টেবিলে ফিরে আসে শায়লা। অমিতের প্লেটের দিকে তাকিয়ে রেগে যায়। প্লেটে হাত দিয়ে উদাস হয়ে কোথায় যেনো তাকিয়ে আছে, হাসি হাসি মুখ। এই ছেলে কি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেলো। ওর ভাইকে একটা ফোন করা দরকার। কিছুক্ষণ পর হয়ত বলবে, ভাবী একটা শাড়ি দাও, পরবো। পাগল ছেলেরা মেয়েদের পোশাক পরতে পছন্দ করে। আর মেয়েগুলি পরতে চায় ছেলেদের পোশাক। তারপর রাস্তায় নেমে যাবে। গলির মাথায় গিয়ে হাত তুলে গাড়ি থামানোর চেষ্টা করবে। পাগলদের প্রধান কাজ হলো ট্রাফিক কন্ট্রোল করা। শহরের ট্রাফিক ব্যাবস্থা যে ঠিক নেই এটা পাগলেও বুঝতে পারে। শুধু বুঝতে পারে না পুলিশ ডিপার্টমেন্ট।

কি হলো তুমি খাচ্ছো না কেনো?

অনেকটা ধমক দিয়ে কথা বলে শায়লা। অমিতকে শাসন করার খুব একটা অধিকার শায়লা পায় নি। কারণ অজিতের স্ত্রী হয়ে এ বাড়িতে এসেই শায়লা দেখেছে অমিত এক জোয়ান ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, অনার্সের ছাত্র। এতোবড় ছেলেকে নিশ্চয়ই শাসন করা যায় না। তা-ও যদি অমিত কিংবা অজিত কেউ ওকে বলে কয়ে এই অধিকার দিতো? আজ হঠাৎ করেই অমিতকে ধমকে উঠলো কেনো শায়লা? এই ধমকটা অমিতেরও খারাপ লাগে না। বরং ওর কেনো জানি মনে হয় আরো আগেই ভাবীর উচিত ছিলো মাঝে-মধ্যে ওকে ধমক-টকম দেওয়া। শায়লাকে এই মুহূর্তে অমিতের খুব কাছের মানুষ মনে হয়। সব মানুষেরই একজন খুব কাছের মানুষ থাকা দরকার, যার কাছে নিজেকে ঝিনুকের মতো অবলীলায় খুলে দেওয়া যায়। অমিতের জীবনে তেমন মানুষ নেই। শায়লাই হতে পারে অমিতের সেই মানুষ।

অমি তোমার জন্য একটা খবর আছে।

কি খবর?

প্রশ্নটা করেই অমিত তাকায় শায়লার দিকে। শায়লা কি ভয় পায়? ও মিনমিনে গলায় বলে, তার আগে বল তুমি ভাত খাচ্ছো না কেনো?

খেতে ইচ্ছে করছে না ভাবী।

অমিতের গলায় তেমন কোনো অস্বাভাবিকতা নেই কিন্তু শায়লার মনে হয় ও খুব রুক্ষ কণ্ঠে কথা বলছে। পাগল হওয়ার প্রথম স্টেজ। মাত্রাটা পরীক্ষা করা দরকার।

অমি তোমার কি মনে হয় ট্রাফিক পুলিশের একটা চাকরী নিলে ভালো করতে?

অমিত হো হো করে হেসে ওঠে।

ঠিক বলেছো ভাবী। তবে কনস্টেবল না, সার্জেন্ট। তাহলে আমার একটা বাইক থাকতো।

মনে হয় দ্বিতীয় স্টেজের দিকে যাচ্ছে। যেভাবে হো হো করে হেসে উঠলো। প্রথমে সার্জেন্ট, তারপর হবে কনস্টেবল। এরপর নেংটা হয়ে ট্রাফিক কন্ট্রোল করবে।

শাড়ি-টাড়ি পরতে ইচ্ছে....ক...রে তো....মার ক..খনো?

ভেঙ্গে ভেঙ্গে দ্বিধায় জড়ানো কণ্ঠে কথা বলে শায়লা।

এবার অমিত আরো জোরে জোরে হাসে। হাসতে হাসতে প্রায় চেয়ার থেকে পড়ে যাবার অবস্থা হয়। এরপর ও টেবিল থেকে উঠে যায়। বেসিনে হাত ধুয়ে আবার টেবিলে ফিরে আসে।

ভাবী, কিছু মনে কোরো না। আজ আমি খাবো না।

এর মানেটা কি রান্না ভালো হয় নি। পাগলের মতি-গতি বোঝা মুশকিল।

তোমার কি মনে হয় রান্না ভালো হয় নি? যদি এটা মনে হয় তাহলে ভুল ধারণা করবে। রান্না ভালোই হয়েছি। কারণ আমিও খাচ্ছি। খারাপ হলে বুঝতে পারতাম।

শায়লার এখন কাঁদতে ইচ্ছে করছে। একজনতো ব্যাবসা নিয়েই ব্যস্ত, শনিবারেও তার অফিস। আরেকজন অর্ধপাগল, পুরা পাগল হওয়ার পথে।

রান্নার প্রশংসা না করলে ভাবীর মাথায় রক্ত উঠে যায়, এটা অমিতের অজানা না। ভাবীর ধারণা তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাধুনী। খাওয়ার জন্য অমিতকে এতো কথা বলার পেছনে কারণ একটাই, রান্নার প্রশংসা শোনা।

ভাবী এতোক্ষণে তুমি আসল কথাটা বলেছো। আজকের রান্নাটাই যাচ্ছেতাই হয়েছে। নইলে তুমিই বলো, খাবার রেখে উঠে যাওয়ার মানুষ আমি? বুয়াকে দিয়ে কেন যে রান্না করাও, তোমার হাতের রান্না হলে কি আর এতোক্ষণ ভাত নিয়ে বসে থাকতাম, তা-ও আবার আমার প্রিয় কৈ মাছের দোপেয়াজা।

অমিত খুব ভালো করেই জানে আজ শায়লাই রান্না করেছে। কারণ বুয়া তিনদিন ধরে সিএল-এ আছে। ভাবীর লিভ ল-তে একটানা সর্বোচ্চ তিনদিন সিএল নেয়া যায়। বুয়া এবার পুরোটাই নিয়েছে। অবশ্য বুয়ার স্বামী, বিশিষ্ট রিক্সাচালক আব্দুল মাখের, খবর দিয়ে গেছে তার স্ত্রী পেটের পীড়ায় ভুগছে। যেহেতু ভাবীর লিভ ল-তে এখনো সিক লিভ চালু হয় নি তাই বুয়াকে সিএল-ই নিতে হয়েছে। শায়লার অবশ্য অন্য সন্দেহও আছে। জমিলাই এই সন্দেহটা ঢুকিয়েছে।

বেডায় একটা খবিসগো আম্মা। সারাদিন খালি যাতাযাতি করে। দুই দিন রিক্সা চালাইলে তিনদিন যাওনের খবর নাই। খালি পুন্দে পুন্দে লাইগ্যা থাহে। কাফিলার আডা। পরের বাড়ির কাম করি। বেডারে হেই কতা বুজান যায় না। তয় মানুষটা বড় বালাগো আম্মা। আমারে বড় সুহাগ করে।

এরপর জমিলা শরমে মরে যায়। আঁচলটা টানতে থাকে মুখ ঢাকার জন্য।

দোষটা যেহেতু অমিত বুয়াকে দিয়েছে তাই শায়লা আর রান্নার প্রসঙ্গটা লম্বা করতে চাচ্ছে না। কিন্তু অমিতেরতো অজানা থাকার কথা না যে বুয়া ক'দিন ধরে আসছে না। তাহলে কি আমার সাথে রসিকতা করছে। এটা একটা নতুন বিষয়। অমিত কখনোই আমার সাথে রসিকতা করে না। এর মানেটা কি? পাগল কনফার্মড।

ঠিক আছে কৈ মাছ না খাও। এক পিছ মাংস দিই, মাংসটা ভালো হয়েছে।

না দিও না। আমার মুখে রুচি নাই। এক কাজ করো, আমাকে একটা কাপ দাও।

উল্টা পাল্টা কথা শুরু হয়েছে। একবার বলছে রান্না খারাপ। আবার বলছে মুখে রুচি নাই। বিষয়টা কি আজই শুরু হলো, নাকি আরো আগেই শুরু হয়েছে? জানা দরকার। জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়। পাগলকে পাগল বললে ক্ষেপে যাওয়ার কথা। যদি ক্ষেপে না যায় তাহলে বুঝতে হবে এখনো পুরা পাগল হয় নাই। হওয়ার পথে।

শায়লা বললো, কাপ দিয়ে কি করবে? চা খাবে? আগে ভাত খেয়ে ওঠো, আমি তোমাকে কফি করে দেবো।

পাগলেরা ঘন ঘন চা খায়। কাপ দিয়ে না, মগ দিয়ে খায়, বালতি দিয়েও খায়। ঢক ঢক করে গরম চা খায়, তৃষ্ণার্ত রিক্সাওয়ালাদের ঢকঢক করে পানি খাওয়ার মতো। পাগলেরা কখনো চুমুক দিয়ে কিছু খেতে পারে না।

অমিত বললো, আমি চা কিংবা কফি খাবো না। ডাল খাবো। চায়ের মতো রেলিশ করে কাপে নিয়ে ডাল খাবো।

বিষয়টা শায়লার মোটেও ভালো ঠেকছে না। বাসায় ওর ভাই নেই। কখন কি করে বসে কে জানে। পাগলের কোনো আপন পর নেই। মাইশার গলা টিপে ধরতে পারে। অন্য একটা কথা মনে হয় শায়লার। আর তখনি ওর হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে। ওই রকম কিছু করতে চাইলে আমি কি করবো, চিৎকার করবো? ভাইল দিয়ে সময়টা পার করা উচিত। অজিতের ওপর মেজাজটা ওর অতিরিক্ত খারাপ হয়। খালি ব্যবসা ব্যবসা করে। একদিন ফিরে দেখবে বৌ-বাচ্চা

শেষ। বৌ রেইপড আর কন্যা ডেড। ছি ছি আমি এসব কি ভাবছি। তৌবা তৌবা। আসতাগফিরুল্লা রাব্বি মিনকুল্লে জাম্বেউ ওয়াতুবে ইলাইহে লাহাওলা ওয়ালাক্কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিউল আজিম। হে পাক পরওয়ারদেগার, না বুঝে যে কথা ভেবেছি তুমি তা ক্ষমা করে দিও। ডায়নিং স্পেস সংলগ্ন রান্নাঘর থেকে একটা কাপ নিয়ে আসে শায়লা। সাথে একটা পিরিচও আনে। আবার হয়ত বলবে, কাপ এনেছো পিরিচ আনো নাই?

অমিত কাপে ডাল নিয়ে চায়ের মতো চুমুক দিয়ে খাচ্ছে। ঢকঢক করে খাচ্ছে না।

ভাবী, তোমার কি হাসি পাচ্ছে?

হাসি পাবে কেনো? কাপে করে ডাল খাওয়াতো আর খারাপ কিছু না। তুমি ডালের সাথে চিনি মিশিয়েও খেতে পারো। চিনি নিয়ে আসবো? দু'চামচ চিনি দেই? হি হি হি।

হাসি পাবারই কথা। ভাবী শোনো, কাপে করে ডাল খাওয়ার এই বুদ্ধিটা কিন্তু আমার না। আমাদের নিপ প্রফেসর ইয়াহিয়া স্যারের।

নিপ মানে কি?

মনে মনে বলে শায়লা, পাগলের কোনো সাংকেতিক ভাষা?

নিপ মানে নির্বাহী পরিচালক। কাপে করে ডাল খাওয়ার পিছনে একটা ছোটোখাটো ইতিহাস আছে।

সেই ইতিহাসটার নাম নিশ্চয়ই ডাল ইতিহাস। ডাল ইতিহাস শোনার কোনো আগ্রহ নেই আমার।

ঠিক আছে, ডাল ইতিহাস শুনতে না চাও তাহলে ডাল প্ল্যানিংটা শোনো।

ডাল প্ল্যানিং! সেটা আবার কি? ভাত খাওয়ার পরে সবাইকে এক কাপ করে ডাল সার্ভ করা?

তোমারতো দেখি অনেক বুদ্ধি। প্রায় ধরে ফেলেছো।

মনে মনে বলে শায়লা, বুদ্ধির কি দেখেছো। যখন পাবনায় পাঠাবো তখন বুঝবা।

অমিত বলে, অনেকটা ওইরকমই। তবে অমিত'স ডাল প্ল্যানিং ইস লিটল বিট মোর অ্যাডভান্সড।

শায়লার বলতে ইচ্ছে করে, কথায় কথায় ইংরেজি বলছো কেনো? এইটাতো পাগল হওয়ার লক্ষণ। কিন্তু ও কিছুই বলে না। ভালোয় ভালোয় সময়টা পার করতে পারলে হয়। শায়লা বড় বড় চোখ করে তাকায় অমিতের দিকে। ওর চোখের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নেয়। এবার তাকায় ডালের কাপে চেপে বসা ওর চারটি আঙুলের দিকে। আঙুল কাঁপছে।

অমিত আবার বলতে শুরু করে, ভাবছি এখন থেকে মেহমান এলে চা, কফির পরিবর্তে সুদৃশ্য কাপে অতিথিদের ডাল সার্ভ করলে কেমন হয়। খাদ্য হিসাবে চায়ের চেয়ে ডাল অনেক উন্নত। ডালে প্রচুর প্রোটিন আছে। বাঙালী জাতির প্রোটিন দরকার।

এইটাও কি তোমার নিপ'র আইডিয়া?

না, এইটা আমার আইডিয়া। আচ্ছা এবার বলো, আমার জন্য নাকি কি খবর আছে তোমার কাছে? খবর বলো।

একজন তোমার খোঁজ করতে এসেছিলো? ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করলো।

কে সেই একজন?

তুমি বলো দেখি, কে সে?

ফাতেমা বেগম।

কিভাবে বুঝলে?

শায়লা অবাক হয় না। কিন্তু অবাক হওয়ার ভান করে।

ভাবী শোনো। আমি যে বুঝতে পেরেছি এজন্য তুমি কিন্তু অবাক হও নাই, অবাক হওয়ার ভান করেছো।

শায়লার মুখটা চিমসে যায়। যুদ্ধে পরাজিত সৈনিকের মতো একটা অপমানের কালো মেঘ ওর মুখে ভর করে।

মাইন্ড করলা? মশকরা করলাম। ভাবীর সাথে দেওরেরা কি মশকরা করে না? কিভাবে বুঝলাম বলছি শোনো, বিবাহযোগ্য কোনো ছেলের কাছে ভাবী জাতীয় কেউ যখন কোনো কিছু বলার আগে রহস্য করে তখন বুঝতে হবে, তিনি একটি যুবতী নারীর প্রসঙ্গে কথা বলবেন। তোমার কাছে আসার মতো আমার চেনা একজন যুবতী নারীই আছে। মোখলেছউদ্দীন সাহেবের মেয়ে ফাতেমা। খুব সোজা হিসাব। সরল অঙ্ক।

তোমার সরল অঙ্ক ভুল হয়েছে। যে মেয়েটি তোমার খোঁজ নিতে এসেছিলো তার নাম অপু।

অ্যাঁ, কি বললে? কি নাম বললে?

অমিতের মুখ হা হয়ে যায়। ও আর কিছু বলতে পারে না। খুশিতে ওর কিছু একটা করতে ইচ্ছে করছে কিন্তু কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। হঠাৎ এক পশলা বাতাশ এসে জানালার পর্দাটা দুলিয়ে দিয়ে যায়। অমিতের মনে হয় ওর হৃদয়টা দুলে উঠলো। ও একটা নৌকায় বসে আছে। নৌকার কোনো মাঝি-মাল্লা নেই। হাল-বৈঠা নেই। সন্ধ্যার মৃদুমন্দ বাতাশে নৌকাটা নিজে নিজেই দুলছে। দুলতে দুলতে ওকে নিয়ে অবশেষে নৌকাটা এসে ভিড়েছে একটা নির্জন

দ্বীপে। সেই দ্বীপে ওর জন্য পথ চেয়ে বসে আছে এক অপরূপ সুন্দরী। ও নৌকা থেকে নামতেই সুন্দরী বলছে, 'এতো দেরী করলে যুবক। সেই কবে থেকে আমি তোমার পথ চেয়ে বসে আছি'।

অমিতের চোখ যায় নিচের বাগানে, ওখানে গন্ধরাজ ফুলের একটা ডাল অনেকগুলো বৃষ্টিভেজা শাদা ফুলের ভারে নুয়ে আছে। ভেজা ফুলের গন্ধ পানশে হয়ে যায়, সেই গন্ধ বাতাশে ছড়ায় না। কিন্তু অমিতের মনে হয় পুরো ঘরটা এখন গন্ধরাজ ফুলের সুবাসে ম ম করছে। অমিত শায়লার হাত চেপে ধরে। শায়লা কিছুটা ভয় পেয়ে যায়। এই ছেলে জীবনেও এ কাজ করে নি।

অমি তোমার কি মাথায় কোনো গন্ডগোল হয়েছে?

সামান্য হয়েছে।

নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করে অমিত।

ভাবী, ও কি কি জিজ্ঞেস করলো?

ও টা কে?

অপু।

তুমি চেনো না-কি?

পরে বলছি, আগে বলো, আমার সম্পর্কে কি জিজ্ঞেস করলো?

তোমার মাথায় ছিট ফিট আছে কি-না জানতে চাইলো।

ধ্যাৎ ফাজলামো করো না-তো।

মনে হয় মেয়েটা তোমাকে পছন্দ করে।

কি করে বুঝলে?

তোমার সম্পর্কে কথা বলার সময় ওর নাক লাল হয়ে উঠেছিলো। মেয়েরা তার পছন্দের মানুষ সম্পর্কে যখন কথা বলে তখন তাদের নাক লাল হয়। এইটা হলো পছন্দ-অপছন্দ বোঝার একটা লক্ষণ। ডেভেলপমেন্টের ভাষায় তোমরা যাকে বলো ইন্ডিকেটর।

অপু সেই রকম মেয়ে না। ওর নাক ফাক লাল হয় না।

ও..তাই নাকি? আচ্ছা, এ ওই মেয়েটা না, যাকে নিয়ে কাগজে লেখা-টেখা বেরিয়েছিলো?

হ্যাঁ, ও একটা অহেতুক ঝামেলায় পড়েছিলো।

ঝামেলার হেতু যা-ই হোক, তুমি ভাই সাবধানে থেকো। বেশী জড়া-জড়ি কোরো না।

কি বললে?

বললাম বেশী জড়িওনা আর কি।

অমিত এতো সহজভাবে এসব বিষয় নিয়ে ভাবীর সাথে কথা বলতে পারবে আগে কখনো চিন্তাও করে নি। মনে হয় মাথা খুলে যাচ্ছে। মানুষ চিন্তার বাইরেও অনেক কিছু করে। আগে থেকে টের পাওয়া যায় না।

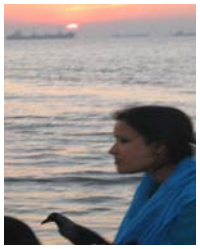

ম্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ.....শব্দ করে টেলিফোন বেজে উঠলো।

ডিজিটাল টেলিফোন বাজছে। মনে হয় ছাগল ডাকছে। ডিজিটাল টেলিফোনের আবিস্কারক কি ছাগল পুষতেন? তিনিও বোধ হয় গান্ধীজীর মতো নিজের ছাগলের দুধ ছাড়া পান করতেন না। শায়লা কিছুটা বিরক্ত হয়।

এই দুপুরবেলা আবার কার শ্রাদ্ধ হলো। তুমি বসে বসে ডাল খাও, আমি দেখি।

না, একদম না। তুমি নড়বে না। ভাত রেখে একবার উঠেছো, আর উঠবে না। তুমি খাও, আমি বরং টেলিফোন ধরি। ডালের কাপ হাতে নিয়ে টেলিফোন ধরবো। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে যদি হাঁটাচলা করা যায়, তাহলে ডালের কাপ হাতে নিয়েও করা যাবে। একসময় এদেশের মানুষ চা খেতে জানতো না। ব্রিটিশরা বাজারে বাজারে গিয়ে মাগনা চা খাওয়াতো। এখন চা এদেশের প্রধান পানীয়, ৬৫ শতাংশ লোক চা পান করে। প্রতিদিন বাংলাদেশে কত কাপ চা খাওয়া হয় জানো?

শায়লা এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ে। মুগ্ধ হয়ে ওর কথা শুনে।

১৮ কোটি কাপ। বিরাট অপচয়। আমি চায়ের পরিবর্তে সমাজে ডালটাকে প্রতিষ্ঠীত করতে চাই। ডালের কেজি চব্বিশ টাকা আর চায়ের কেজি ১২০ টাকা। বিরাট অর্থের সাশ্রয় হবে।

শায়লা মনে মনে বলে, কচু হবে। এক কেজি পাতায় কত কাপ চা হয় তুমি জানো?

ফোন বাজা থেমে গেলো। শায়লার মেজাজ খারাপ হয়। মেজাজের কোনো দিগ পাশ নেই। ফোন বাজলেও খারাপ হয় আবার থেমে গেলেও খারাপ হয়। কোনো জরুরী ফোন হতে পারে। অজিতের ব্যাবসা বিষয়ক ফোন হলে ফোন না ধরার অপরাধে ওকে বকা শুনতে হবে। বকা খেয়ে শায়লা মন খারাপ করবে। মন খারাপ করে রাতে ভাত খাবে না। অজিত তখন ওকে ভাত খাওয়ানোর জন্য পেছন পেছন ঘুরবে। এক সময় ওদের প্রথম দেখা হওয়া টাঙ্গাইলের সেই জ্যোৎস্না রাতের গল্পটা বলবে। শরতের জ্যোৎস্না রাতে হঠাৎ চাঁদের ভেতর থেকে নেমে এলো এক ফুটফুটে ডানা কাটা পরী। নেমেই বললো, আমি চন্দ্রপরী। প্রতি পূর্ণিমা রাতে পৃথিবীর আকাশে উড়ে বেড়াই। দেখো না যুবক, আজ আমার ডানা ভেঙ্গে গেলো। তুমি আমার ডানাটা লাগিয়ে দেবে? খবরদার আমাকে ছোঁবে না কিন্তু, তাহলে আমি আর পরীর দেশে যেতে পারবো না। অজিত বলে, না ছুঁয়ে ডানা লাগাবো কি করে? চন্দ্রপরী তখন হি হি করে হাসে। কিছু একটা বুদ্ধি বের করো। আমিতো জানি মানুষের অনেক বুদ্ধি। অজিত তখন চন্দ্রপরীকে ছুঁয়ে দিয়ে বলে, তোমার আর পরীর দেশে যেতে হবে না।

এই গল্প শোনার পর শায়লার মন ভালো হয়ে যাবে, তারপর দু'জন একসঙ্গে ভাত খেতে যাবে।

অমিত যে ফোন ধরতে না গিয়ে ডালবক্তৃতা করলো, এটা ওর খারাপ লাগে না। মনে হয় দেবর ভাবীর যে চিরায়ত সম্পর্ক, ওদের সম্পর্কটা এতোদিনে ওইদিকে যাচ্ছে। তবে আজ ও অতিরিক্ত কথা বলছে। পরিবারের কেউ হঠাৎ অতিরিক্ত কথা বললে শায়লার ভয় লাগে। দাদীর কথা মনে হয়। কেউ বেশী কথা বললে দাদী গলাটাকে চড়িয়ে বলতেন, 'অতি বকা নিদান ডাকা'। নিদানের অর্থ হলো দুঃখ।

আবার টেলিফোন বাজে। অমিত ডালের কাপে শেষ চুমুকটা দিতে দিতে ফোন ধরে।

হ্যালো।

অমিত ভাই, আমি ম্যানেজার হাশেম।

কি খবর হাশেম সাহেব?

খবর সামাইন্য খারাপ। স্যার হঠাৎ অজ্ঞেন হয়ে গেলেন। আমি সুহরাওয়ার্দি হাসপাতাল তেকে বলছি। ভাবীকে নিয়ে অতি তাড়াতাড়ি চলে আসেন। জুরুরী বিভাগে আছেন, ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নেওয়া লাগতে পারে।

ডাক্তার কি বলেছে?

খুব আস্তে প্রশ্ন করে অমিত।

এ্যাঠাক। তিমুন গুরুতর না-ও হৈতে পারে। ঘাবড়াইবেন না। স্যারকে সাথে সাথেই হাসপাতালে আনা হয়েছে।

অমিত কোনো কথা বলতে পারছে না। ওর হাত থেকে রিসিভার পড়ে যাবার কথা কিন্তু যেন কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গিতে ক্র্যাডলে রিসিভার নামিয়ে রাখে। তারপর খুব স্বাভাবিকভাবে হেঁটে ডায়নিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায়।

শায়লা প্রশ্ন করে, কে?

ভাবী কাপড় বদলাবার কোনো দরকার নেই। এ অবস্থায়ই চলো, বাইরে যেতে হবে।

কোথায়?

অমিতের হঠাৎ এ রকম প্রস্তাবে ঘাবড়ে যায় শায়লা।

পরে বলছি। তুমি মাইশাকে বাড়িওয়ালাদের বাসায় রেখে আসো। একটু জলদি করো ভাবী।

তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কে ফোন করলো? কোথায় যেতে হবে? তোমার ভাইয়ের কিছু হয়নিতো?

যা বলেছি তাই করো প্লিজ, কথা বাড়িওনা। সোহরাওয়ার্দিতে যেতে হবে।

শায়লা ছুটে যায় মাইশার কাছে। হাসপাতাল শব্দটা শুনেই ওর দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

অজিতকে ইনটেনসিভ কেয়ারে রাখা হয়েছে। এখনো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ওখানে কাউকে ঢুকতেও দেওয়া হচ্ছে না। শায়লা কান্না-কাটি করে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। অজিতের কাছে যেতে চাচ্ছে। কিন্তু চাইলেইতো হবে না। অজিত শায়লার স্বামী হলেও এই মুহূর্তে ওর ওপর স্ত্রীর চেয়ে ডাক্তারদেরই অধিকার বেশী। এপ্রণ পরা একজন তরুণী ডাক্তার বেরিয়ে আসতেই সবাই তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। ডাক্তার কিছু বলার আগেই সকলের কাছ থেকে বিক্ষিপ্ত প্রশ্ন ছুটে আসছে। বক্তব্য একটাই 'কি অবস্থা'। তিনি বেশ গম্ভীর গলায় গিজ্ঞেস করলেন, পেশেন্টের ক্লোজ রিলেটিভ কে? কোনো কথা না বলে শায়লা এগিয়ে গিয়ে ডাক্তারের সামনে দাঁড়ায়।

জ্ঞান ফিরেছে। তবে এখনো বিপদমুক্ত না। উনি কি আপনার স্বামী?

শায়লা ওপর-নিচ মাথা নাড়ে।

কোলেস্টরেল বেশ হাই ছিলো। তিনটা ব্লক আছে, বাইপাস করতে হবে।

অমিত দুই স্টেপ এগিয়ে শায়লার প্যারালাল দাঁড়ায়।

আপনারা ভেতরে যেতে পারেন। দয়া করে ওখানে গিয়ে কান্না-কাটি করবেন না।

হিল এবং ফ্লোরের মিউজিক তুলে তরুণী ডাক্তার চিরাচরিত গতিতে চলে গেলেন।

ভাবী তুমি যাও, আমি কেঁদে-টেদে ফেলতে পারি।

শায়লা কোনো কথা না বলে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ঢুকে গেলো। আসলে অমিত চাচ্ছে শায়লা অন্তত কিছুটা সময় একান্তে তার স্বামীর কাছে থাকুক।

অতি আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে হার্টের মধ্যে তিনটা ব্লক নিয়ে অজিত স্বাভাবিকভাবে কথা বলছে।

ভয় পেয়েছো চন্দ্রপরী ? কিচ্ছু হবে না। আমি ঠিক ভালো হয়ে যাবো। আমার মেয়ে কোথায়?

ফাতেমাদের ঘরে রেখে এসেছি।

মেয়েটাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

শায়লা কান্না চাপা দিতে চেষ্টা করে। বলক দেওয়া দুধের হাঁড়ির ঢাকনা চেপে ধরলে যে শর্বনাশ হয়, তা-ই হলো শায়লার। ও শব্দ করে কেঁদে উঠলো। কিছুতেই আর কান্না সামলাতে পারছে না। ওর ভেতরে উথলে ওঠা এক সমুদ্রের ঢেউ। নার্স কটমট করে তাকালো শায়লার দিলে। শায়লার এখন কি করা উচিত? অজিত ওর ডান হাতটা শায়লার মাথায় তুলতে গিয়ে দেখলো সে হাত নাড়াতে পারছে না। আর তখনি এক রাজ্যের চিন্তা এসে ঢুকলো ওর মাথায়। মাত্র ব্যাবসাটা জমে উঠছিলো। অমিকেতো কিছুই বোঝানো হয় নি। ও কি পারবে সব সামলাতে? ঠিক তখনি সেই তরুণী ডাক্তারটি এসে ঢোকে।

আপনাকে একটু আসতে হবে আমার সাথে।

শায়লা সব কাগজপত্রে সই করে দিলো। অপারেশন হবে রাত আটটায়।

মোখলেছউদ্দীন তার মেয়েকে নিয়ে একরকম দৌড়াতে দৌড়াতেই হাসপাতালে এসে ঢুকলেন। অমিতকে দেখেই তিনি রেগে গেলেন।

এইটাতো বাবা ঠিক করো নাই। আমিতো ঘরেই ছিলাম। নামাজের বিছানায় ছিলাম। এমন একটা বিপদ, তোমরা আমাকে সঙ্গে না নিয়ে কি করে আসতে পারলে?

ফাতেমা ঠোঁট কামড়াচ্ছে। এর দুটো কারণ হতে পারে। হয় বাবার আচরণ ওর কাছে অস্বাভাবিক লাগছে। নয়তো কি বলবে, কি বলবে না, ভেবে ঠিক করতে পারছে না। খেই হারিয়ে ফেলেছে। অমিত ভাবছে এই ভদ্রলোকের কথার জবাব একটাই, স্ট্রেইট স্যরি বলে ফেলা।

চাচা ভুল হয়ে গেছে। ফোনে খবরটা পেয়েই আমরা চলে আসি। শুধু মাইশাকে দিতে আমি আপনাদের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। না হলেতো খবরটাই দেওয়া হতো না।

আমিওতো ফাতেমাকে সেই কথাই বলছিলাম। তা, অজিত বাবাজির অবস্থা এখন কি প্রকার?

আমিও দেখি নি। ডাক্তার জানালেন জ্ঞান ফিরেছে।

আলহামদুলিল্লাহ। মা জননী কোথায়?

কিছু কাগজপত্র সাইন করতে হবে, ভেতরে আছে।

কাগজপত্র সাইন করতে হবে কেনো? অপারেশন হবে নাকি?

জ্বি, বাইপাস করতে হবে। হার্টে ব্লক আছে।

এখনি করতে হবে?

ডাক্তার বললেন, তাড়াতাড়ি করে ফেলাই ভালো।

কোনো চিন্তা করবে না বাবা। আল্লাহ তা'আলা বিপদ আপদ দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেন। সেই পরীক্ষায় যারা পাশ করে, তারাই প্রকৃত মানুষ।

জ্বি।

মা ফাতেমা। ওগুলো তোমার ভাইয়ার হাতে দাও।

বেশ কিছু ফলের প্যাকেট ফাতেমার হাতে। অনেকক্ষণ ধরে ওগুলো নিয়ে ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

চাচা কিছু মনে করবেন না। এ অবস্থায় ওগুলো রাখারতো কোনো জায়গা নেই। অপারেশন হয়ে গেলে যখন ভাইয়াকে কেবিনে নেওয়া হবে, তখন রাখা যাবে।

ঠিকইতো বলেছো বাবা। আমার বাবা মাথার ঠিক নাই। মা ফাতেমা, ওইগুলি তোমার কাছেই রাখো।

ফাতেমা সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেও অমিতের বেশ অস্বস্তি লাগছে। এই মেয়েটা কি তিন/চার কেজি ওজনের প্যাকেটগুলো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে? কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? সব ঠিকঠাক মতো হয়ে গেলে পেশেন্টকে কেবিনে নিয়ে যেতে এখনো পাঁচ/ছয় ঘন্টা বাকী। এক কাজ করলে হয় না, কেবিনটা আমরা আগে ভাগেই নিয়ে নিই।

'না নিয়ম নাই। হাসপাতালের কেবিনের মালিক হইলো গিয়া রুগী। রুগীর আগে অন্য কেউ ঢুকনের নিয়ম নাই। অপারেশনের আগে কেবিন পাওয়া যাবে না।'

এই কথাটা বলার পর মোখলেছউদ্দিন নিজের ওপর বেশ খুশি হন। মনে হয় তিনি একটা দার্শনিক কথা বলে ফেলেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, গত কিছুদিন যাবৎ হঠাৎ হঠাৎ তিনি দার্শনিকের মতো কথা বলছেন। গত কয়েকদিন ধরে বেশ গরম পড়েছে। গতকাল বিকালের দিকে আকাশে খুব মেঘ করেছিলো। কালো কালো মেঘের মাথায় তামাটে মেঘের আবরণ। এইটা ঝড়ের লক্ষণ। হঠাৎ এক পশলা শীতল বাতাশ জানালা দিয়ে হুড়মুড় করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে। সারাদিন মরুময় লু হাওয়ার পরে এই ঠান্ডা বাতাশটা ছিলো একটা বেহেশতের ফু। মোখলেছউদ্দিনের স্ত্রী হাজেরা বেগম প্রশান্তিতে চোখ বন্ধ করে বললেন, 'আহা, পরাণটা জুড়াইয়া গেলো'। আর মোখলেছউদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে একটা দার্শনিক বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন।

এখনি ঝড় হবে। শীতল বাতাশ তারই আলামত। ঝড় হইলে কি হয়? সব লন্ড-ভন্ড হয়। ঘর-বাড়ি ভাঙ্গে, গাছ-পালা ভাঙ্গে, গরু-বাছুর হারায়। মানুষের দুঃখ-কষ্ট বাড়ে। দুঃখের আগে আল্লাহপাক মানুষকে এক দন্ড শান্তি দেওয়ার জন্য বেহেশত হইতে এই শীতল বাতাশ পাঠান।

এই বক্তৃতাটা দেওয়ার পরও মোখলেছউদ্দিন নিজের ওপর বেশ খুশি হয়েছিলেন। তিনি কি ধীরে ধীরে দার্শনিক হয়ে যাচ্ছেন? তার বাপজান বলেছিলেন, মৃত্যুর দু'য়েক বছর আগে থেকে পরহেজগার মানুষেরা অতি মূল্যবান কথা বলতে শুরু করেন। আর পাপী বান্দারা বলে আবোল-তাবোল কথা। মোখলেছউদ্দিনের বাপজান মৃত্যুকালে বলেছিলেন, 'এই বছর ভালো ধান হবে'। সেইবার, যার এক কানি জমির চাষ, তার ঘরেও খোরাকির টান পড়ে নাই। আমিও কি বাপজানের মতো হয়ে যাচ্ছি? কথাটা ভেবেই মোখলেছউদ্দিন কেঁপে ওঠেন। মৃত্যুর জন্য তিনি এখনো প্রস্তুন হন নাই।

এইবার ইনশাল্লাহ হজ্জব্রত পালনের নিয়ত করেছেন, তার আগে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। বিবাহযোগ্য মেয়ে ঘরে রেখে পিতা হজে যেতে পারেন না। হজ কবুল হয় না।

মোখলেছউদ্দিনের কথা ঠিক হয় নাই। অজিতকে কেবিনে ট্রান্সফার করা হয়েছে। কেবিন নম্বর সাত, লাকি সেভেন। সাত নম্বর কেবিন পাওয়ায় সবাই খুব খুশি। একটু পরে যে অজিতের অপারেশন হবে, এইটা যেন এখন আর কোনো ঘটনাই না। মানুষ অতি দ্রুত সব কিছু মেনে নেয়। লাকি সেভেন একটা সাইকোলোজিক্যাল ব্যাপার। এই কেবিনের রোগি কি কখনো মারা যায় নাই? নিশ্চয়ই গিয়েছে। হোক সাইকোলোজিক্যাল ব্যাপার। কেবিন নম্বর সাত, এইটাকে কেন্দ্র করে যে ওরা এতো বড় একটা শোক সামলে উঠেছে এটাই একটা বড় ব্যাপার। এই সময়ে সাইকোলোজিক্যাল স্ট্রেংথটাই বেশী দরকার। এখন সাড়ে সাতটা বাজে। আটটায় অপারেশন। অপারেশন সাতটায় হলে ভালো হত। লাকি সেভেনের বেনিফিট পাওয়া যেত। যাবতীয় প্রস্তুতি চলছে। ফাতেমা এখনো হাসপাতালে। মোখলেছউদ্দিন মাগরেবের আগেই চলে গেছেন। যাওয়ার সময় অমিতের ওপর ফাতেমার ভার দিয়ে গেছেন। 'বাবাজী, ওকে তোমাদের কাছে রেখে গেলাম। শায়লা মা জননী একলা আছে। ফাতেমা থাকলে সুবিধা হবে। তুমি ওকে বাসায় পৌছে দিও'। ম্যানেজার হাশেম বিস্তর খাটাখাটনি করছে। এতো দ্রুত কেবিন পাওয়াটাও হাশেমের কারিশমা। কারিশমা ছাড়া সরকারী হাসপাতালে কোনো কিছুই পাওয়া যায় না।

মোখলেছউদ্দিন আবার হাসপাতালে এসেছেন। এবার তিনি সঙ্গে তার স্ত্রী হাজেরা বেগমকে নিয়ে এসেছেন। হাজেরা বেগম ঠিকমতো হাঁটতে পারছেন না। আথরাইটিস বেড়েছে। কাজের মেয়ে সুহেলি একটা রূপার পানের বাটা হাতে নিয়ে তার পেছন পেছন ঘুরছে। তিনি বাইরে কোথাও গেলে এই রূপার পানের বাটাটি ব্যবহার করেন। এটি তার মায়ের হাতের চিহ্ন। তবে এখন তিনি কিছুটা সঙ্কিত। দামী ব্যাবহার্য হলো প্রদর্শনের জন্য। যেখানে একজন মানুষের জীবন নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলছে সেখানে মূল্যবান বস্তু প্রদর্শন ঠিক হচ্ছে কি-না তিনি বুঝতে পারছেন না। এটা নিয়ে তার খুব টেনশন হচ্ছে। টেনশনে তার কপাল ঘেমে যাচ্ছে। তিনি বিশেষ কোনো ইঙ্গিতময় ভাষায় সুহেলির দিকে তাকাতেই সুহেলি রূপার পানের বাটাটি তার দিকে বাড়িয়ে দিলো। হাজেরা বেগম দুটি সিঙ্গেল খিলি একসঙ্গে মুখে পুরে দিলেন। টেনশন বেড়ে গেলে তিনি ডবল খিলি ছাড়া খেতে পারেন না। হাজেরা বেগম বসেছেন এটেনডেন্টের বিছানায়, পাশেই শায়লা। ওরা বসেছে পেশেন্টের বিছানার দিকে মুখ করে। পেশেন্টের বিছানাটি পরিপাটি করে গোছানো। ধবধবে শাদা চাদর টানটান করে বিছানো। পাতলা একটি অতি নরম তুলার বালিশ। বালিশটিও দুধের মতো শাদা কভারে ঢাকা। এখন রাত সাড়ে আটটা বাজে। অপারেশন চলছে। শায়লা কোনো কথা বলতে পারছে না। ওর চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়ছে। হাজেরা বেগম বোবা মানুষের মতো নিঃশব্দে শায়লার মাথায় অবিরাম হাত বুলিয়ে যাচ্ছেন। শায়লার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে তিনি কেবিনের এদিক-সেদিক তাকাচ্ছেন। হাসপাতালের সব কিছু অতো ধবধবে শাদা হয় কেনো। সেভলনের কড়া গন্ধ সারা হাসপাতালের বাতাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। শাদা রঙ আর সেভলনের গন্ধটা একসাথে মিশে কেমন একটা অপার্থিব ভীতিকর পরিবেশ তৈরী করেছে। হঠাৎ সেভলনের গন্ধটা যেন একটি নীরব মৃত্যুর গন্ধ হয়ে হাজেরা বেগমের নাকে লাগে। তার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। হাজেরা বেগমের কি আলোর মৃত্যুদিনটার কথা মনে পড়ে গেলো? তার ভেতরে একটা কান্নার স্রোত ক্রমশ হেঁচকির ঢেউ তুলছে।

মোখলেছউদ্দিন হাসপাতালের টানা বারান্দায় পায়চারী করছেন। তিনি আর টেনশনটা নিতে পারছেন না। তার অতিরিক্ত টেনশন হবার একটি বিশেষ কারণ আছে। তার কেবলি মনে হচ্ছে খারাপ কিছু ঘটে যাবে। আর কথাটা যতোবারই মনে হচ্ছে ততোই তার টেনশন বেড়ে যাচ্ছে। একটু দূরে সোডিয়াম বাতির নিচে অমিত আর ফাতেমা দাঁড়িয়ে আছে। তার আরেকটু দূরে ম্যানেজার হাশেম, একা। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে দুটি শুভশব্দ শোনার জন্য। অপারেশন সাকসেসফুল। মোখলেছউদ্দিন হাঁটতে হাঁটতে অমিত ও ফাতেমার কাছে চলে এলেন।

মা, আমি তোমার আম্মিকে নিয়ে এখনি চলে যাবো। বেশী রাত হলে তোমার আম্মির আথরাইটিস বেসুমার বেড়ে যাবে। হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন তাকে কোলে করে নিয়ে যেতে হবে।

ফাতেমা কিংবা অমিত কেউ কোনো কথা বলছে না। মোখলেছউদ্দিন কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করে কেবিনের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে। ওটি থেকে অজিত বেরিয়ে এলো রাত এগারোটায়। ফাতেমা তখনো হাসপাতালে। ডাক্তার জানিয়েছে অজিতের জ্ঞান ফিরবে ভোর রাতের দিকে। বেশ অনেকদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। বাইপাস সার্জারী এই

হাসপাতালে এর আগে আর মাত্র একটি হয়েছে। এটি সেকেন্ড কেইস। কর্তৃপক্ষের বিশেষ নজর রয়েছে পেশেন্টের প্রতি। সাকসেস স্টোরি লিখতে হবে।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। রাত এখন বারোটা। হাসপাতালের ভেতর রাত-দিন একই রকম। ওয়ার্ডগুলিতে রুগী, ডাক্তার, নার্স আর আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতির একটা চাপা গুঞ্জন সারাক্ষণই জিইয়ে আছে। ২৪ ঘন্টাই রুগী আসছে, রুগী যাচ্ছে। দূর দূরান্ত থেকে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব আসছে। হঠাৎ করে শায়লা যেন নিজের পা দুটির ওপর শক্ত করে দাঁড়ায়। ভেঙ্গে পড়লে চলবে না, এই আত্মোপলব্ধি ওর মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয়। চট করে সে সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে এ পরিস্থিতিতে কার কি করণীয় সেই সিদ্ধান্ত দিতে শুরু করে।

হাশেম ভাই, আপনি একটা স্কুটার নিয়ে বাসায় চলে যান। কাল সকালে ঠিক সময়ে অফিসে যাবেন। অফিসে গিয়ে হাসপাতালে ফোন করে স্যারের খোঁজ নেবেন। টাকা-পয়সা লাগলে আমি আপনাকে জানাবো। চেক-ফেকে সই করতে হলে বলবেন, আমি সময় বলে দেবো, তখন আসবেন।

হাশেম আমতা আমতা করে, ঘাড় চুলকায়।

ভাবী, স্যারের জ্ঞেন না ফিরা পর্যুন্ত আমি থাকি?

না। আপনার রাত জাগবার কোনো দরকার নেই। আপনিও অসুস্থ হয়ে পড়লে ব্যাবসা দেখবে কে?

কথাটা বলেই শায়লা অমিতের দিকে তাকায়। ইঙ্গিতটা অমিত বুঝতে পারে। এতোদিন ও ভাইয়ের শ্বশুরের টাকায় দাঁড় করানো ব্যাবসায় ইনভল্ব হতে চায় নি। অজিতও ওকে টানে নি।

হাশেম ভাই আপনি আর দেরী করবেন না। এখনি চলে যান।

জ্বি অ। আসসেলামুওয়ালাইকুম।

অমি, তুমিও ফাতেমাকে নিয়ে চলে যাও। সাবধানে যেও। মাইশাকে সকালে নিয়ে এসো। তুমি তোমার অফিস থেকে দু'দিন ছুটি নাও। পারবেতো?

হ্যাঁ, পারবো।

ফাতেমা, তুমি এদিকে এসো। অমি, তুমি একটু বাইরে যাওতো।

শায়লা ফাতেমাকে বুঝিয়ে দেয় ওর জন্য কাল সকালে কি কি দরকারি জিনিস পাঠাতে হবে। এরপর ও ফাতেমার হাতে আলমারির চাবিটা তুলে দেয়। চাবিটা নিতে গিয়ে ফাতেমার হাত কেঁপে ওঠে। শায়লা ভাবছে বিপদের সময় সবাইকে কেমন আপন মনে হয়। কাউকেই অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। ফাতেমার মনে হয় ও যেন এ পরিবারেরই একজন। কোনোকালেও এ পরিবারের সাথে ওর কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিলো না এবং এখনো নেই, এটা যেন একটা শৈল্পিক মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই না। ও এ পরিবারেরই একজন। এ পরিবারের দুঃখ ওর নিজের দুঃখ। এ পরিবারের আনন্দ ওর নিজের আনন্দ। 'অপারেশন সাকসেসফুল' কথাটা শোনার সাথে সাথে ওর চোখ দিয়ে আনন্দে হরহর করে পানি এসে গেলো। এ অবস্থায় শায়লাকে একলা রেখে ওর বাসায় যেতে ইচ্ছে করছে না।

ভাবী আমিও থাকি তোমার সাথে?

কথাটা বলেই ও কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলো। ও কি খুব অশোভন কিছু বলে ফেলেছে? এ বয়সের একটা অনাত্মীয় মেয়ে এরকম কিছু বলতে পারে না। ও-তো কাউকে খুশী করার জন্য এ কথা বলে নি। এ সময়েতো এটাই বলবার মতো অতি স্বাভাবিক কথা। তাহলে ওর এতো খারাপ লাগছে কেনো? রক্তের সম্পর্কই কি তাহলে সব? হৃদয়ের সম্পর্কের কোনো মূল্য নেই? মূল্য হয়ত আছে কিন্তু কোনো জোর নেই। কোনো অথরিটি নেই।

সারা পথ ফাতেমা একটি কথাও বলে নি অমিতের সাথে।

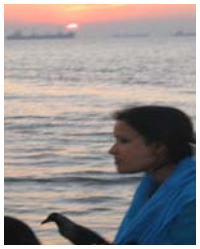

মানুষের জীবনে কিছু মুহূর্ত থাকে যে মুহূর্তগুলি খুবই আনন্দের কিন্তু এক ধরনের শূন্যতায় মনটা যেন কেমন করে ওঠে। কাল রাতে অমিতের সঙ্গে অপুর কথা হয়েছে। টেলিফোনে। বেশ অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছে ওরা। সে কথায় তেমন কোনো আবেগ ছিলো না। খুব স্বাভাবিক, গোছানো কথাবার্তা। ওরা যে দু'জন দু'জনকে ভালোবাসে একথা স্পষ্ট করে কেউ কিছুই বলে নি। বলার কোনো প্রয়োজনও হয় নি। একটা জিনিস অপু নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পেরেছে অমিত ওকে ভালোবাসে, অত্যন্ত ম্যচিউরড সে ভালোবাসা এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কোথায় যেন ওদের দু'জনের মধ্যে একটা বড় রকমের অমিল রয়েছে। সেই অমিলটা ধরতে পারছে না অপু।

এটা অপু ঠিক বুঝতে পারছে ভালোবেসে ও গুটিয়ে গেছে। ওকে এখন অনেক কিছুই ভাবতে হয়। বাবার কথা। আপুর কথা। কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া ওইসব উটকো ঝামেলার কথা। এইসব ভাবনা ওকে ক্রমশ দূর্বল করে তুলছে। মনের জোর কমে যাচ্ছে। আর সমস্ত ভাবনার কেন্দ্রে একজন টিপিক্যাল বাঙালী নারীর মতো ঠাই করে নিয়েছে একটি ঘরের স্বপ্ন। ওর সমস্ত স্বপ্নগুলো যেন একটা প্রচন্ড ঘূর্ণনের মধ্য দিয়ে এসে স্থির হয়ে যাচ্ছে একটি ছোট্ট গোছানো ঘরের ভেতর। শুধু চারদিকে না, শুধু দশদিকে না, এতোদিন অপু বিনা বাঁধায়, বিনা লজ্জায় একসাথে তাকাতো সবদিকে। ওর ছিলো মাছির মতো মাথার চারপাশে অসংখ্য খোলা চোখ। ওর ঘরের চারপাশে ছিলো অসংখ্য খোলা জানালা। এখন বুঝি ওর সবদিকের জানালাগুলো একটা একটা করে বন্ধ হয়ে আসছে। শেষমেষ কি মাত্র একটা জানালা দিয়ে পশ্চিমের লাল আকাশ থেকে শেষ বিকেলের এক চিলতে আলো এসে পড়বে ওর ঘরে? আর সেই আলোতেই ওকে চিনে নিতে হবে সমস্ত জীবনের দীর্ঘ পথ। জীবনটা আটকে যাবে এত্তোটুকুন একটা ঘরের মধ্যে?

তবু ওর ভালো লাগছে। সব হারানোর কষ্টের চেয়েও অনেক বেশী আনন্দের ভালোবাসাকে খুঁজে পাওয়া। অপু সেই স্নিগ্ধ, নির্মল, কাঙ্খিত ভালোবাসা খুঁজে পেয়েছে। কিছুতেই তাকে হারাতে দেবে না। কোনো কিছুর বিনিময়ে না। শূন্যতাবোধের ভেতর থেকে ক্রমশ একটা নির্লিপ্ত ভালোলাগাবোধ ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। একসময় আনন্দে ওর চিৎকার করতে ইচ্ছে করে। ভীষণ জোরে শব্দ করে কাঁদতে ইচ্ছে করে। আনন্দ ও শূন্যতার যুগল স্রোতটি ওকে অস্থির করে তোলে। মনটা কেমন উড়ু উড়ু হয়ে ওঠে। কি করবে, কি করবে না কিছুই বুঝে উঠতে পারে না অপু। আসলেই কি এই অবস্থাটা ওর ভালো লাগছে ? নাকি স্তরান্তরের এই খেলায় ও পরাজিত হতে চাচ্ছে না। তাই জোর করে ভালো লাগাবার চেষ্টা করছে? বুঝতে পারে না অপু। কেমন যেন একটা অন্যরকম অনুভূতি। এ অনুভূতি ব্যাখ্যা করা যায় না।

কামিনী ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণটা মরে আসছে। যেসব ফুল রাতে ফোটে ওরা দিনের বেলায় তেমন ঘ্রাণ ছড়ায় না। সারারাত ওর জানালা দিয়ে বাগান থেকে একটা মিষ্টি ঘ্রাণ আসছিলো। খুব ভোরে, সূর্য ওঠার আগে, ঘ্রাণটা যেন আরো তীব্র হয়ে উঠেছিলো। অপু উঠে গিয়ে ওয়াডরোবের ওপর থেকে হাত ঘড়িটা তুলে নেয়। সাড়ে ছ'টা বাজে। এতো ভোরে ও কখনো ঘুম থেকে ওঠে না। আজ ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যাবার পর আর ঘুমোতে পারছে না। ঘরটা কেমন অগোছালো হয়ে আছে। কাল রাতে ড্রেস বদলায় নি ও। জিনস পরেই শুয়ে পড়েছিলো। ওর দু'জোড়া জুতো ফ্লোরের ওপর ছড়ানো ছিটানো, তার একপাটি জিভ উল্টে কাত হয়ে পড়ে আছে পড়ার টেবিলের নিচে। সারা ফ্লোরে কাপড়-জামা, তোয়ালে, মোজা, চুলের ব্যান্ট, পুরোনো ম্যাগাজিন-বই আরো কতো কি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। অগোছালো ঘরের দিকে তাকিয়ে খুব লজ্জা পায় অপু। দু'হাতে মুখ ঢেকে নিজের হাসিটাকে চেপে ধরে। ঘর গোছানো ওর অভ্যেস না। অথচ ইচ্ছে করে পুরো ঘরটা আজ গুছিয়ে ফেলতে। সবকিছু এতো অগোছালো, কেউ দেখলে কি ভাববে? কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই একজনের মুখ ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাহলে কি এই একজনের জন্যই ওর সকল আয়োজন? অজান্তেই এই একজন একটি অদৃশ্য সিংহাসনে বসে ওর সমস্ত চিন্তাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে? এরকম অগোছালোতো অপুর ঘর সব সময়ই ছিলো। আর কখনোতো অমন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে নি ও। একটু একটু করে ওর সবকিছু বদলে যাচ্ছে। যা কিছু এতোকাল ওর ভালো লাগতো তা যেন আজ খারাপ লাগতে শুরু করেছে আর যা কিছু এতোকাল খারাপ লাগতো তা যেন আজ ওর ভালো লাগতে শুরু করেছে। এর অর্থ কি? অপু এর অর্থ জানে না। সব মানুষের জীবনেই

একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। অপুর জীবনে বুঝি সেই পরিবর্তনের দখিনা হাওয়ার ঝাপটা লাগতে শুরু করেছে। জিনসটা খুলে ফেলতে ইচ্ছে করে ওর। গায়ের শুভ্র শাদা টি-শার্টটিও খুলে ফেলতে ইচ্ছে করে। তারপর পুরোপুরি নগ্ন হয়ে বাথরুমে ঢুকে যাওয়া যায়। বাথরুমে গিয়ে দীর্ঘ সময় নিয়ে শাওয়ারের ঠান্ডা পানিতে সমস্ত শরীরটা ধুয়ে একটা লাল শাড়ি পরতে ইচ্ছে করে অপুর। সব মেয়ের বুকের ভেতরই কি একটা লাল শাড়ির স্বপ্ন থাকে? কথাটা ভেবেই ও ফিক করে হেসে দেয়। ও-তো কোনোদিন শাড়ি পরে নি। মিলির বিয়েতে পরার একটা সুযোগ হতো কিন্তু সেটাতো আর হলো না। মিলিতো ভেগে গিয়ে বিয়ে করলো।

অপুর ইচ্ছে করছে নিজেকে পুরোপুরি বদলে ফেলতে। জীবনের একটিমাত্র জানালা দিয়ে যেটুকু আলো আসছে, সে আলো একান্তই ওর। আর কারো ভাগ নেই ওতে। অপু সেই আপন আলোয় স্নাত হতে চায়, ভিজতে চায় পরিপূর্ণভাবে। একটা পাগলা হাওয়া ওর ভেতরের তরঙ্গটাকে উসকে দেয়। এই সাত সকালে ও গলা ছেড়ে গাইতে শুরু করে,

আলো আমার আলো ওগো আলো ভুবন ভরা
আলো নয়ন ধোয়া আমার আলো হৃদয় হরা ।।

নাচে আলো নাচে ও ভাই আমার প্রাণের কাছে
বাজে আলো বাজে ও ভাই হৃদয় বীণার মাঝে
জাগে আকাশ ছোটে বাতাশ হাসে সকল ধরা।।

আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি
আলোর ঢেউয়ে উঠলো মেতে মল্লিকা মালতি

মেঘে মেঘে সোনা ও ভাই যায় না মানিক গোনা
পাতায় পাতায় হাসি ও ভাই পুলক রাশি রাশি
সুর নদীর কূল ডুবেছে সুধা নিঝর ঝরা।।

গান শেষ করে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে অপু। নিজেকে ও আর ধরে রাখতে পারছে না। একটা অন্তহীন অস্থিরতা ওকে যেন কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে। ওর কেবলই ইচ্ছে হচ্ছে নতুন করে জন্ম নিতে। জীবনকে বদলে ফেলার জন্য চাই নতুন জন্ম, আর এজন্য প্রয়োজন পুরোনো স্বত্বার বিলোপসাধন, মানে মৃত্যুবরণ। জন্ম নেবার জন্য নগ্ন হওয়া প্রয়োজন। মানুষ পৃথিবীতে নগ্ন হয়েই আসে। আবার নগ্ন হয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। এই মুহূর্তে অপু মৃত্যু এবং জন্মের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। এতোদিন এই বাড়িতে, এই হামিদা লজে যে উচ্ছল, চঞ্চল, দূরন্ত এক দস্যি মেয়ে ছিলো, যার নাম অপু আজ তার মৃত্যু ঘটবে। এরপর এখানেই জন্ম নেবে আরেক নতুন অপু। যে অপু জিনস পরতে জানে না, বন্ধুদের সাথে পাল্লা দিয়ে রাজপথে সাইকেল চালাতে জানে না। দু'পা এগিয়ে গিয়ে দরোজার লকটা পুশ করে দেয় ও। এ ঘরে এখন আর কেউ ঢুকতে পারবে না। এ ঘরটা এখন শুধুই ওর, অপুর নিজস্ব পৃথিবী। সেই পৃথিবীতে আর কারো প্রবেশাধিকার নেই।

এই নির্জন পৃথিবীতে আজ, ১৯৯৪ সালের ১০ই জুলাই, একুশ বছরের এক দূরন্ত অপুর মৃত্যু ঘটবে এবং এর পরেই জন্ম নেবে আবহমান গ্রাম বাংলার লাজুক বধুর মতো স্নিগ্ধ, অপাপবিদ্ধ, আনকোরা, নিস্পাপ এক মায়াবতী, রূপবতী অপু। হঠাৎ ওর মনে হয় এ নামটিও বদলাতে হবে। আজ এই ঘরে যে নতুন মানুষটির জন্ম হবে ওর নাম অপু হতে পারে না। কিছুতেই না। কি নাম হতে পারে? এক মিনিট চুপ করে থাকে ও। চোখ বন্ধ করে। হ্যাঁ, পেয়ে গেছে। নদী। ওর নাম হবে নদী। এই ঘরের নির্জন পাহাড়ে জন্ম নেবে এক লাজুক নদী। তারপর বাংলার সমতলভূমি চুম্বন করে প্রবাহিত নদী গিয়ে মিলিত হবে অমিত নামের এক গভীর সমুদ্রে।

ঘর গোছানোর ইচ্ছেটা ওর মধ্যে আবারো প্রবল হতে শুরু করেছে। ওয়াডরোবের একটা ড্রয়ার টেনে খুলে ফেলে অপু। এক এক করে সবগুলো কাপড় বের করে এনে খাটের ওপর রাখে। কাপড়গুলো নেড়ে-চেড়ে, ঝেড়ে ঝেড়ে পূনরায় ভাঁজ করে অপু। এরপর এক এক করে আবার ঢোকায় ড্রয়ারে। কিন্তু কি আশ্চর্য সবগুলো কাপড় এখন আর ড্রয়ারে জায়গা হচ্ছে না। অথচ এর ভেতরেইতো সবগুলো কাপড় ছিলো। যে অপুকে ও আজ হত্যা করতে যাচ্ছে, চাইলেই কি ও

আবার সেই অপু হতে পারবে? না পারবে না। কারণ মানুষকে হত্যা করা যায় কিন্তু সেই জীবন তাকে আর ফেরত দেওয়া যায় না। ড্রয়ার থেকে বের করা কাপড়গুলো হয়ত পূনরায় ড্রয়ারে ঢোকানো যায় কিন্তু মানুষ একবার একটা অবস্থান থেকে বেরিয়ে এলে আবার সেই অবস্থানে ফিরে যেতে পারে না।

কাপড়গুলো ড্রয়ারে ঢোকানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে অপু। ওকে পারতেই হবে। পরাজিত হতে ও পারবে না। ও-কি গোছানো কাপড়গুলো আরো অগোছালো করে ফেলেছে? এজন্যই কি কাপড়গুলো একই ড্রয়ারে ফের ঢোকাতে গিয়ে আর আটছে না? কিন্তু কি অবাক কান্ড, ওতো গোছাতেই চেয়েছিলো। তাহলে অগোছালো হয়ে গেলো কেনো? খুব সহজেই এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যায় অপু। যে অপু ঘর গোছাতে গিয়েছিলো ঘর গোছানোতো ওর স্বভাব নয়। মানুষ তার স্বভাবের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে না। অপু হচ্ছে দূরন্ত এক পাহাড়ী ঝর্ণার নাম। যে মেয়েটি সবকিছু আলতো হাতে গুছিয়ে রাখবে তার নাম নদী। দূরন্ত ঝর্ণার প্রবাহিত জলধারা থেকে জন্ম নেয়া নিটোল, শান্ত, লাজুক, স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ নদী।

বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে ফিরে আসে অপু। ভাবছে, এ ঘরেতো কেউ নেই। আর কেউ এখন ঢুকতেও পারবে না। তাহলে আর বাথরুমে যাওয়া কেনো? ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেইতো গায়ের কাপড়গুলো এক এক করে খুলে ফেলা যায়। কেউ দেখবে না। কেউ দেখবে না, এই কথাটি অপুর কাছে খুব খারাপ লাগে। আসলে দেখা উচিত। শুধু একজন দু'জন না, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের দেখা উচিত কেমন করে একটি পাহাড়ী ঝর্ণা নিস্তরঙ্গ এক শান্ত নদী হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে একজন মানুষের ভেতর থেকে জেগে উঠা, দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে বেড়ে উঠা একটি জীবন্ত সত্বার মৃত্যু ঘটছে এবং ধীরে ধীরে জন্ম নিচ্ছে আরেকটি নতুন স্বত্বা। খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে, উন্মুক্ত বাতাশে গভীর নিঃশ্বাস টেনে, নিসর্গের ভেতরে অবগাহন করেই এ পরিবর্তনটা হওয়া উচিত ছিলো। তা যখন পারা যাচ্ছে না অন্তত বাথরুমের রুদ্ধতার চেয়ে এ ঘরখানিতো ঢের বড়। না হয় ধরেই নেয়া যাক, এ ঘরখানিই আজ বিশ্বব্রহ্মান্ড।

প্যান্টের বেল্টটা একটানে খুলে ফেলে ও। ছুঁড়ে দেয় মেজের ওপর। তারপর জিনসের জিপার টানে, বোতাম খোলে। জিনসটা হাঁটু অব্দি নামিয়ে এনে কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করে। তারপর আবার প্যান্টটা পরে ফেলে। একটা ভুল হয়ে গেছে। এসব খুলে টুলে স্নান সেরেতো শাড়ি পরতে হবে। কিন্তু শাড়ি কোথায়? শাড়িতো জোগাড় করা হয় নি। তাছাড়া শাড়ি কিভাবে পরতে হয় তা-ও জানে না অপু। পরাটা না হয় খুব শাদামাটাই হলো। না হয় কোনোরকমে সারা গায়ে পেঁচিয়ে নিলো কিন্তু একটা শাড়িতো চাই। চট করে ডিসিশনটা নিয়ে ফেলে অপু। মিলির ঘর থেকে একটা শাড়ি চুরি করতে হবে। 'চুরি' শব্দটা ওকে পীড়া দেয়। একটা মহৎ কাজের সাথে কিছুতেই চৌর্যবৃত্তি জড়িত হতে পারে না। সাথে সাথে শোধরায় অপু। বোনের কাছ থেকে ধার নিচ্ছি। ধার নেওয়া যেতে পারে। ধারের মধ্যে কোনো অপরাধ নেই। তবু নিজেকে ওর ছোট ছোট লাগছে। প্ল্যানিংটা আরো গোছানো হওয়া উচিত ছিলো।

মিলি মনির মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়ে গেছে। মিলির ঘরে ঢোকে অপু। ওর ভালো শাড়িগুলি সব সেগুন কাঠের আলমারিতে তুলে রাখা। আলমারির চাবি কোথায়? চাবি খুঁজে পায় না অপু। ওয়াডরোবের ড্রয়ার থেকে একটা সাধারণ শাড়ি তুলে নেওয়া যায়। নিচের ড্রয়ারটা টেনে বের করে ও। একটা লাল পেড়ে অফ হোয়াইট সুতি শাড়ি তুলে নেয়। অসাধারণ। এই সাধারণ সুতি শাড়িটাকেই ওর কাছে অসাধারণ মনে হচ্ছে। ওর কেবলি মনে হচ্ছে ও বুঝি ঠিক এই শাড়িটাই খুঁজতে এসেছিলো।

মিলির ঘর থেকে বেরিয়ে আসে অপু। খন্দকার সাহেব নিচে, চিরতার শরবত খেয়ে ড্রয়িংরুমে হাঁটাহাঁটি করছেন। বাথরুমে যাওয়ার পূর্বপ্রস্তুতি। সিরাজ মিয়া নাস্তার টেবিল সাজাতে ব্যাস্ত। হামিদা লজ জেগে উঠেছে। আরেকটি নতুন দিনের আয়োজনে সকলেই ব্যস্ত রোজকার রুটিন মাফিক। শুধু একজন নিজেকে পাল্টে ফেলছে, জীবন বদলের খেলায় মেতে উঠেছে। তার জন্য আজকের সকালটি আর দশটি সকালের মতো না, এ এক অন্যরকম সকাল, এ এক অন্যরকম দিন। সে খবর কেউ জানে না।

অপু ওর ঘরে ঢুকে দরোজা লক করে দেয়। প্রচন্ড একটা রোমাঞ্চ কাজ করছে ওর মধ্যে। ভেতরে ভেতরে ভীষণ উত্তেজিত অপু কিন্তু প্রতিটা পদক্ষেপ ফেলছে মেপে মেপে। যেন একটু এদিক ওদিক হলেই নৌকা ডুবে যাবে। ও এগুচ্ছে দেখে শুনে, খুব ধীরে সুস্থে। এরকম একটা দ্বৈত স্বত্বা ও কিভাবে ম্যানেজ করছে ভেবে অবাক হয় অপু। আসলে দ্বৈত স্বত্বা না, এটা হচ্ছে ট্রানজিশনাল স্টেজ। মৃত্যুযন্ত্রণা এবং জন্মানন্দ এই দুয়ের একটা মিশ্র অনুভূতি ওর ভেতরে প্রচন্ড ওলট-পালট ঘটাতে শুরু করেছে। এ যেন কেবল জিনসটা একটানে খুলে ফেলে একটা সুতি শাড়ি গায়ে জড়ানো না। এ

কেবল পোশাক বদলানো না। জীবনের রঙ বদলানো। জীবনের সুর বদলে দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে জীবন বদলানো। একটা স্বত্বার মৃত্যু অনুভব করা এবং একটা নতুন স্বত্বার জন্ম দেওয়া।

শাড়িটা খাটের ওপর রেখে দিয়ে উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়ায় অপু। উত্তরদিকে মাথা রেখেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত হতে হয়। এবার একে একে শরীর থেকে সমস্ত আবরণ বিচ্ছিন্ন করতে শুরু করে। প্রথমে প্যান্ট খোলে। তারপর গায়ের শাদা টি-শার্ট। ওর পরণে এখন সুতির স্বচ্ছ অন্তর্বাস। একটি শাদা প্যান্টি ও একটি হালকা ঘিয়ে রঙের ব্রা। এগুলো খোলার আগে নিজের শরীরটাকে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে দেখতে থাকে অপু। ব্রাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ওর সুগঠিত, ফর্শা, গম্বুজের মতো স্তনযুগল বেরিয়ে আসে। এবার একটানে কোমর থেকে প্যান্টিটা নামিয়ে দেয়। প্রথমে বাম পা ও পরে ডান পা গলিয়ে সেটা খুলে এনে ফ্লোরের ওপর ছুঁড়ে দেয়। চুলের ব্যান্টটা খুলে ফেলার সাথে সাথে একরাশ গভীর কালো চুল ছড়িয়ে পড়ে ওর ঘাড়ের নিচে, সমস্ত পিঠের ওপর।

ওর চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এইমাত্র ওরই গা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কাপড়গুলো।

ও এখন সম্পুর্ণ নগ্ন। নিজের নগ্ন শরীরের দিকে তাকিয়ে নিজেই অভিভূত হয়ে যায় অপু। কী আগুনবতী যৌবন ওর শরীরের প্রতি পরতে পরতে। নারীর নগ্ন শরীর ঈশ্বরের তৈরী শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। মায়ের কথা ভাবে অপু। ওকে তিন বছরের রেখেই ওর মা মারা গেছেন। মায়ের কোনো স্মৃতিই অপুর মনে নেই। তবু ও মাকে কল্পণা করে। ওর মা-ও নিশ্চয়ই ওরই মতো একসময় এরকম যৌবনবতী ছিলেন। ওর শরীরের মতোই একটি ঈশ্বর্যশীলা শরীর ছিল। সেই শরীরের ভেতর থেকেই বেরিয়ে এসেছে মিলি, অপু। অপুর এই চমৎকার শরীর ভেদ করেও একসময় ঠিক এমনি করেই কেউ বেরিয়ে আসবে। পৃথিবীকে ও উপহার দেবে একটি অনিন্দ্য সুন্দর শিশু। একটি নতুন প্রজন্ম। কী অদ্ভুত ক্ষমতা মেয়েদের। অপুর এখন নিজেকে ঈশ্বরের কাছাকাছি ক্ষমতাময় মনে হচ্ছে। ও সৃষ্টি করতে পারে। তা-ও কাগজ, পিতল, কাচ, সোনা বা হীরার কোনো বস্তু নয়। মানুষ। ও মানুষ সৃষ্টি করতে পারে। নিজের বুকের দিকে তাকায় অপু। কী চমৎকার সুগঠিত বুক, নতুন প্রজন্মের খাদ্যভান্ডার। এ বুক, এ শরীর পৃথিবীকে ফুলে ফলে ভরিয়ে তোলার জন্যই ঈশ্বর তৈরী করেছেন। হঠাৎ ওর মনে হয় কে যেন ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এক অসামান্য নারীমূর্তি।

কে আপনি?

আমি তোর মা।

মা, আমি যে নগ্ন, আমি লজ্জিত।

লজ্জার কিছু নেই। তুইতো আমার মেয়ে। আমার পেটের ভেতর থেকে ঠিক এ অবস্থায়ইতো তুই বেরিয়ে এসেছিলি। শোন অপু, আমি তোকে কিছু কথা বলতে এসেছি।

কি কথা?

তুই যা করছিস, তা কি ভেবে চিন্তে করছিস?

অবশ্যই।

আরো ভেবে দেখ। তোর বাবার কথা ভাব। বয়স হয়েছে। মিলির শোকটা নিতে পারলেও তোরটা হয়ত নিতে পারবে না।

বাবা খুব শক্ত মানুষ।

নিজের স্বার্থে এই যুক্তিটা দিচ্ছিস। তিনি আসলে অতো শক্ত নন।

কিন্তু আমি যে মা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।

সিদ্ধান্ততো বদলানোও যায়।

না যায় না। আমি সিদ্ধান্ত বদলাই না।

জানি। তুইতো আমারই মেয়ে। দোয়া করি তুই সুখী হ।

মা কি সত্যি সত্যি এসেছিলেন? নাকি এটা আমার অবচেতন তৈরী করেছে? কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়ায় অপু। আবার ফিরে আসে ওর নিজস্ব জগতে। বাথরুমে ঢোকে ও। দরোজা খোলা রেখেই শাওয়ারের চাবি ঘুরিয়ে পানি ছাড়ে। ফেনা ফেনা করে সারা গায়ে, বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলোতেও সাবান লাগায়। দীর্ঘ সময় নিয়ে শাওয়ারের ঠান্ডা জলে শরীর ভিজিয়ে একটা শাদা তোয়ালে জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে অপু। শুধু একটা তোয়ালে ওর বুক এবং নাভীর নিচের খানিকটা অংশ ঢেকে রেখেছে। বাকী পুরো শরীরটা খোলা। সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থার চেয়ে এ অবস্থায় ওকে আরো বেশী রূপবতী লাগছে। ওর সমস্ত শরীর থেকে যেন আগুন বেরুচ্ছে। মনে হচ্ছে স্বর্গ থেকে কোনো অপ্সরী নেমে এসেছে মাটির পৃথিবীতে।

এবার তোয়ালেটা খুলে ফেলে ও। আর তখনি মনে হয়, ওর মা ওকে নিতে এসেছিলেন। মানুষ মৃত্যুশয্যায় মৃত আপনজনদের দেখতে পায়। ঝুপ করে তোয়ালেটা ওর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে। আবারো উত্তরমূখী হয়ে মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়ায় ও। চোখ বন্ধ করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে দু'হাতের তালু একত্রিত করে বুক বরাবর তুলে আনে। এখন ওকে দেখে মনে হচ্ছে একটি পাহাড়ী ঝর্ণার পাদদেশে দাঁড়িয়ে প্রার্থনারত কোনো এক জলদেবী।

এবার দু'চোখ বন্ধ করে স্পষ্ট উচ্চারণে মন্ত্রপাঠের মতো বলতে শুরু করে,

''হে অনিন্দ্য সুন্দর বসুন্ধরা, গ্রহ, নক্ষত্র, ধুমকেতু,
ছায়াপথ, রাত্রির আকাশ, তারকারাজি এবং নিঃসীম
অন্ধকার ব্ল্যাকহোল, হে বিশ্বব্রহ্মান্ডের তাবৎ প্রাণীকূল,
বৃক্ষ তৃণলতাগুল্ম পত্রপল্লবিত নিসর্গের সবুজ বনানী,
প্রান্তরের ঘাস, সুদূরের কাশবন, হে ঋতুবৈচিত্রময়
প্রকৃতির জলবায়ু, বহমান সময়, সৃষ্টিমৌলপঞ্চভূত,
শিশুর নির্মল হাসি, পীড়াক্লিষ্ট মানুষের বেদনার্দ্র অশ্রুপাত
হে মহাজলধিসকল, অভ্যন্তরের মৎস্য, তৃণশৈবালগুল্ম
তিমি, সরীসৃপ, হাঙ্গর ও উত্তাল জলস্রোত
হে মায়াবতী হরিণী, হিংস্র হায়েনা ও বন্যজন্তুসকল
ফলবতী বৃক্ষকূল ও অরণ্যের পুস্পরাজী
হে মহাপ্রাজ্ঞ জটায়ু, সহস্রবর্ষী কচ্ছপ ও পেঁচা
শত্রুবিনাশী আবাবিল পাখি, মরুজাহাজ উষ্ট্রকূল
ও হরিৎ প্রন্তরের জেব্রা, পবনপুত্র বীর হনুমান
রাক্ষসরাজ রাবণ, অগ্নিসিদ্ধ সীতা ও কুরুক্ষেত্রের অর্জুন
নিস্কাম কর্মের ব্রতোপদেশ শ্রীমত ভগবত গীতা, রামায়ন
মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, পবিত্র বাইবেল ও সকল আসমানী কিতাব
হে পীর পয়গম্বরগণ, অগ্নিজলবায়ু ও আকাশের দেবতাসকল
তোমরা দেখ, আজ এই মুহুর্তে অপু নামের একটি আধুনিক নারীর মৃত্যু ঘটছে এবং একই স্থানে জন্ম নিচ্ছে আবহমান গ্রাম বাংলার লাজুক নারীস্বত্বার প্রতীক এক রমনী, যার নাম নদী। ধ্বংশ হোক অপুর জয় হোক নদীর।''

এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ চোখ খোলে অপু। তারপর ধীরে ধীরে লালপেড়ে অফহোয়াইট সুতী শাড়িটি গায়ে জড়িয়ে নেয়।